ISSN : 3105-4137

মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' *(মুসলিম হা/১১৬৩)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৯তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০২৬

আশূরা উপলক্ষ্যে শী'আদের বিকৃত শোকসংস্কৃতি

يا حسين
يا علي
يا فاطمه
يا حسن
يا حسين
يا حسين
পিঠ চাপড়ানো
তাযিয়া মিছিল
বিদআত

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد : ٢٩ العدد : ٩ ذوالحجة و محرم ١٤٤٧- ١٤٤٨ﻫ/ يونيو ٢٠٢٦
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

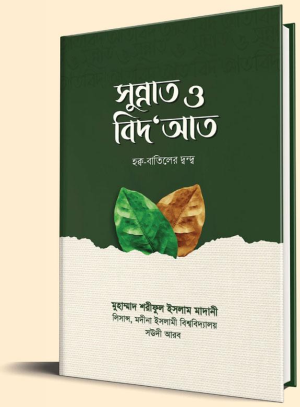
সুন্নাত ও বিদ'আত
হক্ব-বাতিলের দ্বন্দ্ব
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সঊদী আরব

সুন্নাত ও বিদ'আত

হক্ব-বাতিলের দ্বন্দ্ব

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ আলোয় জীবনকে আলোকিত করতে এবং বিদ'আতের বিভ্রান্তি থেকে ঈমানকে সুরক্ষা দিতে বইটি এক অকাট্য দলীল। হক্ব-বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বে সঠিক পথের দিশা পেতে প্রত্যেক মুমিনের পাঠাগারে বইটি থাকা একান্ত যরূরী।

অর্ডার করুন

☎ ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮০৫-৯৫৮৮২২

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ
ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ
দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ
হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর!!
নিম্নে তোমার জীবনের সফরসূচী দে
মৃত্যুকে স্মরণ করুন! পরকালীন প্রস্তুতি গ্রহণ করুন!
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

- দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ
- ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ
- ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ
- হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর!!
- মৃত্যুকে স্মরণ করুন! পরকালীন প্রস্তুতি গ্রহণ করুন!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। www.hadeethfoundationbd.com

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

بسم الله الرحمن الرحيم

ISSN : 3105-4137

রেজি: নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

যুলহিজ্জাহ-মুহাররম ১৪৪৭-১৪৪৮ হি.
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩৩ বাং
জুন ২০২৬ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া
(আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
একাউন্ট নং : Masik At-Tahreek, 00712200 00115, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

◆ সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
◆ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
◆ হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
◆ হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
◆ হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
◆ তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
◆ ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮
(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয় :**
- সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও আমাদের আত্মপরিচয়ের লড়াই ০২

◆ **প্রবন্ধ :**
- রিয়া-র ভয়াবহতা ও ক্ষতি ০৩
  -ড. নূরুল ইসলাম
- ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ : আত্মশুদ্ধির সোপান ও প্রশান্তির চাবিকাঠি ০৯
  -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- গোপন পাপ : ঈমান বিধ্বংসী এক নীরব ঘাতক ১৩
  -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

◆ **প্রচ্ছদ রচনা :**
- আশূরা উপলক্ষ্যে শী'আদের বিকৃত শোকসংস্কৃতি ২১
  -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◆ **দিশারী:**
- দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর শারঈ বিধান : একটি পর্যালোচনা ২৬
  -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◆ **শিক্ষাঙ্গন :**
- প্রাইভেট নাকি সেল্ফ এডুকেশন *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩১

◆ **করণীয়-বর্জনীয় :**
- তাহিইয়াতুল মাসজিদ আদায়ে অভ্যস্ত হৌন! ৩৫
  -ড. ইহসান ইলাহী যহীর

◆ **দো'আ ও যিকর :**
- কিছু হারানোয় বা যেকোন বিপদে মুমিনের সান্ত্বনা : এক অনন্যসাধারণ দো'আ *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ৩৭

◆ **নবীনদের পাতা :**
- ইন্টারনেট ব্যবহারে সতর্কতা *-হাসীবুর রশীদ* ৩৮

◆ **আত্মচিন্তা :**
- আল্লাহকে ভালোবাসি *-সারওয়ার মিছবাহ* ৪১

◆ **কবিতা :** ৪৫
- জামা'আতবদ্ধ জীবন
- শান্তির ধন

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
◆ **মুসলিম জাহান** ৪৪
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

জুন ২০২৬

সম্পাদকীয়

২৯তম বর্ষ
৯ম সংখ্যা

সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও আমাদের আত্মপরিচয়ের লড়াই

গত ৪ঠা মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি শক্তির যে গেরুয়া বিপ্লবের উত্থান ঘটেছে, তা আমাদের জন্য কেবল একটি রাজনৈতিক সংবাদ নয়, বরং একটি বড় সতর্কবার্তা। বিশেষ করে বিজেপি ক্ষমতায় গিয়েই যেভাবে বাংলাদেশের সীমান্তে মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে নিশ্ছিদ্র কাঁটাতার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং মুসলমানদের নাগরিক তালিকা (NRC) থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, তা স্পষ্ট করে দেয় যে, এ অঞ্চলের মুসলিম জনপদ আজও কত বড় হুমকির মুখে। নির্বাচনের পূর্বেই ইসির বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনে লক্ষাধিক ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে। আল-জাযীরার প্রতিবেদনে দেখা গেছে প্রায় ৯ কোটি ৬০ লাখের মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ ভোটার (১২ শতাংশ ভোটার) এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, যাদের অধিকাংশ মুসলিম ও সংখ্যালঘু। গোবিন্দপুর, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, মালদহ প্রভৃতি শহরে বঞ্চিতদের অধিকাংশই মুসলিম অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর উত্তর ও দক্ষিণ যেলা জুড়ে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। পত্রিকার প্রতিবেদনে দেখা গেছে ৪মে থেকে ৭মের মধ্যে আট যেলায় কমপক্ষে ৩৪টি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ধরা পড়েছে। মসজিদ, মুসলমানদের বাড়িঘর, গরুর হাট, গোশতের আড়ত এবং দোকানপাটে আক্রমণসহ মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি যথেচ্ছ হামলা হয়েছে। এখনও তার যের রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চলমান। মুসলিম জনপদগুলিতেও বিরাজ করছে চাপা ভয়-আতংক।

এই পরিস্থিতি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি গঠন কেন অপরিহার্য ছিল। দূর্ভাগ্যজনকভাবে বিগত কয়েক দশক ধরে আমাদের দেশের একদল বুদ্ধিজীবী সুকৌশলে ৪৭-এর ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। ইতিহাসের লুকোচুরির আশ্রয় নিয়ে তারা অবিরাম প্রচার করেছে যে, কেবল ভাষার ভিত্তিতেই এদেশের জন্ম। আমাদের ঐক্যের প্রতীক হল বাংলা ভাষা। অথচ আজকের পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বাস্তবচিত্র বলছে, ভাষা এক হলেও কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে সেখানে মুসলমানরা বহিরাগত নাগরিকে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রকৃত ভিত্তি কেবল ভাষা নয়, বরং ইসলাম; যার ওপর ভিত্তি করেই এদেশের মানচিত্র আঁকা হয়েছিল। এই সত্যটি মুছে ফেলার যে ষড়যন্ত্র চলমান রয়েছে, তার নামই সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ বা ‘বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্যবাদ’।

সাংস্কৃতিক এই যবরদস্তিবাদের অংশ হিসেবে খুব সুকৌশলে আড়াল করা হয়েছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রকৃত বীরদের। মাওলানা আকরাম খাঁ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী এবং কাফী ভাতৃদ্বয়ের মত নেতাদের ত্যাগ ও দূরদর্শিতাকে গুরুত্বহীন করা হয়েছে, কারণ তাঁরা মুসলিম জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। কেননা ১৬ই ডিসেম্বরের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতির মাধ্যমে তিনি এক ঐতিহাসিক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি মূলত ভারতীয় আধিপত্যবাদকে মেনে নিতে পারেননি এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোন আপস করতে চাননি। একই কারণে মেজর জলীলকে যুদ্ধের পরপরই কারাবরণ করতে হয়েছিল, কারণ তিনি ভারতীয় বাহিনীর লুটতরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীর মতো আপসহীন নেতা, যিনি সারাজীবন আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং কবি ফররুখ আহমদের মতো ব্যক্তিত্বদের আধুনিক পাঠ্যক্রম ও আলোচনা থেকে প্রায় নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে।

সেক্যুলার এই গোষ্ঠীটি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে পুরোপুরিভাবে একটি ধর্মহীন বা সেক্যুলার রূপ দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। ৭২-এর সংবিধান রচনা করা হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এবং এতে যুক্ত করা হয়েছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ- চারটি মূলনীতি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে তারা ইসলামকে ‘প্রতিক্রিয়াশীলতা’র তকমা দিয়ে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। অথচ এদেশের সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করেছিল শোষণমুক্তির জন্য, ধর্মহীন হওয়ার জন্য নয়। ইসলামের চিহ্নগুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাসকে অপব্যাখ্যা করা ছিল তাদের একচেটিয়া সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজমের হাতিয়ার, যা দিয়ে নতুন প্রজন্মের মগজ ব্যাপকভাবে ধোলাই করা হয়েছে। ২৪-এর জুলাই বিপ্লব আবার নতুন করে এমন প্রপঞ্চের সামনে দাঁড় করিয়েছে, যেখান থেকে আমরা ইতিহাসের আয়নায় আমাদেরকে নতুনভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এখন সময় এসেছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে নতুনভাবে গড়ার। আমাদের চেতনাকে নতুনভাবে বিনির্মাণের। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ‘গেরুয়া বিপ্লব’ আমাদের পুনরায় সেই ৪৭-এর চেতনা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমাদের নতুন প্রজন্মকে বুঝতে হবে, আদর্শহীন বাঙালী কিংবা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারবে না। ভাষার ভিত্তিতে জাতির চেতনা নির্মিত হয় না। অতএব আগামী প্রজন্মকে এমনভাবে গড়ে উঠতে হবে যেন তারা এই ভূখণ্ডের সঠিক জন্ম-ইতিহাস ও ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে। মুসলিম জাতিসত্তাকে যেন তারা পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতে পারে। যেহেতু সমকালীন বিশ্বে সাংস্কৃতিক প্রভাব কেবল বিনোদন বা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি শিক্ষা, মিডিয়া, ইতিহাসচর্চা এবং মূল্যবোধ নির্মাণের মাধ্যমে গভীরে প্রভাব বিস্তার করছে। তাই এই আধিপত্যবাদকে মোকাবিলার জন্য আমাদের তরুণদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও শিক্ষাগতভাবে তৈরী হতে হবে।

সাংস্কৃতিক জবরদস্তির যিঞ্জীর ভেঙে আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানা এবং সেই পথ ধরে ইসলামের কালজয়ী আদর্শের পথে ফেরাই হোক বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় জিহাদ। ভারতের আধিপত্যবাদী মানসিকতা এবং দেশীয় দোসরদের মিথ্যা বয়ান রুখে দিয়ে একটি তাওহীদী চেতনাসম্পন্ন জাতি গঠন করাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য। এলক্ষ্যে এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ও নেতৃত্বে আনতে হবে আমূল সংস্কার। সর্বত্র আনতে হবে নৈতিকতা ও ইসলামী মূল্যোবোধের নবজাগরণ। মিডিয়া ও সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে কুরআন ও হাদীছের ন্যায়বিচারের মহান আদর্শ। রুখে দিতে হবে উদারতাবাদ, আধুনিকতাবাদের নামে চলমান কালচারাল ফ্যাসিবাদের মিথ্যা বয়ান। এ বিষয়ে আমাদের ইসলামী দলগুলো এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে যত দ্রুত সচেতন হবেন, ততই বিশ্বমঞ্চে একটি শক্তিশালী ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে আমাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ তৈরী হবে। আমরা মুক্তি পাব আত্মপরিচয়হীনতা থেকে। এ জাতি খুঁজে পাবে তাদের প্রকৃত লক্ষ্য। এই পথেই একটি গৌরবজ্জ্বল বিশুদ্ধ ইসলামী আদর্শের দেশ হয়ে গড়ে উঠবে আমাদের এই বাংলাদেশ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন! *(স.স.)*।

রিয়া-র ভয়াবহতা ও ক্ষতি

-ড. নূরুল ইসলাম

রিয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা। এটি ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতির জন্য অনেক বড় একটি বিপদ। কেননা তা আমলকে ধ্বংস করে দেয়। নিম্নে রিয়ার ভয়াবহতা ও ক্ষতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল-

১. রিয়া দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর :

রিয়া মুসলমানদের জন্য দাজ্জালের থেকেও ভয়ংকর ও বিপজ্জনক। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. فَقَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ؛ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ. 'একদিন রাসূল (ছাঃ) আমাদের কাছে এসে দেখলেন, আমরা মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছি। তখন তিনি বললেন,'আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিব না, যা আমার কাছে তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয়ংকর। আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন! তখন তিনি বললেন, তা হল গোপন শিরক। একজন ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়ায়। অতঃপর মানুষ তার দিকে দেখছে ভেবে সে তার ছালাতকে সুন্দর ও সুশোভিত করে তোলে (অর্থাৎ মানুষকে দেখানোর জন্য সুন্দর করে ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করে)'।[1] উক্ত হাদীছে الرَّجُلُ বা পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হলেও এর দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়ই উদ্দেশ্য। এখানে পুরুষকে তাখছীছ বা নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত পেশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই বিধানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। উছূলে ফিক্বহের পরিভাষায় একে مَفْهُومُ اللَّقَبِ বলা হয়।[2]

শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেন, سُمِّيَ الرِّيَاءُ شِرْكًا خَفِيًّا، لِأَنَّ صَاحِبَهُ يُظْهِرُ أَنَّ عَمَلَهُ لِلَّهِ، وَيُخْفِي فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا تَزَيَّنَ بِإِظْهَارِهِ أَنَّهُ لِلَّهِ، بِخِلَافِ الشِّرْكِ الْجَلِيِّ. 'রিয়াকে গোপন শিরক বলা হয়েছে। কারণ রিয়াকারী বাহ্যত তার আমলকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত বলে প্রকাশ করে, অথচ অন্তরের গভীরে অন্যের সন্তুষ্টি ও প্রশংসা লাভের মনোবাসনা লালন করে। সে আল্লাহ্র জন্য কাজ করেছে-এমন ভান করে নিজের আমলকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। কিন্তু অন্তরে থাকে ভিন্ন অভিপ্রায়। এই অভ্যন্তরীণ গোপন প্রবণতার কারণেই এটি প্রকাশ্য শিরক থেকে ভিন্ন'।[3]

আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে ভয়াবহ। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে প্রত্যেক ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশনা দিয়েছেন।[4] কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও যে বিষয়টিকে বেশী ভয় করেছেন সেটি হল শিরক। কারণ দাজ্জালের বিষয়টি হবে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। পক্ষান্তরে রিয়া বা লৌকিকতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গোপনীয় হওয়ায় তা থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য। বিভিন্ন আকৃতি ও রূপে এটি মানুষকে আক্রমণ করে। কেবল নির্দিষ্ট একটি রূপ বা ধরনের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ থাকে না। এজন্য জনৈক সালাফ বা পূর্ববর্তী বিদ্বান বলেছেন, مَاجَاهَدْتُ نَفْسِي عَلَى شَيْءٍ مُجَاهَدَتَهَا عَلَى الإِخْلَاصِ 'আমি আমার নফসের বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে এত কঠিন সংগ্রাম করিনি, যতবার করেছি ইখলাছ অর্জনের জন্য'। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ. 'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ও ধন্য হবে ঐ ব্যক্তি, যে অন্তরে গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বলেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই)।[5] সুতরাং শুধু মুখে এই বাক্য উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়; বরং অবশ্যই এর সাথে ইখলাছ বা আন্তরিক নিষ্ঠা এবং এমন আমল থাকতে হবে, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে।[6]

২. রিয়া নেকড়ে বাঘ থেকেও অধিক বিপজ্জনক :

নেকড়ে বাঘ ছাগলপালের জন্য যেমন বিপজ্জনক, মানুষের জন্য আমলের মধ্যে রিয়ার অনুপ্রবেশ তার চেয়েও অধিক বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক। কা'ব বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ 'দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসাত্মক নয়, যত না বেশী ধ্বংসাত্মক মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য'।[7] অন্য বর্ণনায় এসেছে, غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا 'যখন ছাগপালের রাখাল অনুপস্থিত থাকে'।[8] দুনিয়ার সম্পদ, মাল-মর্যাদা ও সম্পদের লোভ কীভাবে মানুষের দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর তার

---

[1] *ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪; আহমাদ হা/১১২৫২; মিশকাত হা/৫৩৩৩।*

[2] *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (কায়রো: দারু ইবনিল জাওযী, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি.), পৃ. ৪৫৪-৪৫৫।*

[3] *তায়সীরুল আযীযিল হামীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ, পৃ. ৪০১।*

[4] *বুখারী হা/১৩৭৭; মুসলিম হা/৫৮৮।*

[5] *বুখারী হা/৯৯।*

[6] *আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ, পৃ.৪৫৩।*

[7] *তিরমিযী হা/২৩৭৬; দারেমী হা/২৭৭২, মিশকাত হা/৫১৮১।*

[8] *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯৭৮৭।*

একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, রাখালের অনুপস্থিতিতে একদল ছাগলের মধ্যে রাতের বেলায় দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ঢুকে ইচ্ছামতো ছাগলগুলোকে আক্রমণ করে ও খেয়ে ফেলে। তাদের আক্রমণ থেকে অল্পসংখ্যক ছাগলই বাঁচতে পারে- বরং বলা যায়, খুব কম সংখ্যকই বাঁচতে পারে। ঠিক তেমনি রিয়া মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে তার দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়।

৩. রিয়া জাতির অধঃপতন ও পরাজয়ের কারণ :

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ ‘এ উম্মতের দুর্বলদের দো‘আ, তাদের ছালাত এবং ইখলাছের কারণে আল্লাহ এ উম্মতকে সাহায্য করবেন’।[৯]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ্র শত্রুদের উপর বিজয়ের মূল উপাদান হল ইখলাছ। আর তার বিপরীতে রিয়া ধ্বংস, অধঃপতন ও পরাজয়ের কারণ। সূরা আনফালে আল্লাহ তা‘আলা জিহাদের সময় মুমিনদেরকে ইখলাছ অবলম্বন এবং বেশী বেশী তাঁর যিকির করার নির্দেশ দেওয়ার পর যুদ্ধে বের হওয়ার ক্ষেত্রে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন না করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ‘আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের বাসস্থান (মক্কা) থেকে বের হয়েছিল দর্পভরে ও লোক দেখিয়ে এবং যারা আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদের বাধা দিত। অথচ আল্লাহ তাদের সকল কাজ পরিবেষ্টন করে আছেন’ *(আনফাল ৮/৪৭)*।

বদর যুদ্ধের দিন আবু জাহল দর্পভরে বলেছিল, ‘আল্লাহ্র কসম! আমরা বদরে যাব, সেখানে তিনদিন থাকব ও আমোদ-ফূর্তি করে পান ভোজন করব। এর ফলে সমগ্র আরব জাতির উপরে আমাদের শক্তি প্রকাশিত হবে ও সকলে ভীত হবে’।[১০] মূলত কাফের গোষ্ঠী রাসূল (ছাঃ) ও মুমিনদের সাথে বদর প্রান্তরে নিজেদের বীরত্ব, সাহস ও শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে মানুষের প্রশংসা ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করার গোপন মনোবাসনা পূরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছিল উল্টোটা। এজন্য মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। অন্যথা কাফেরদের মতো তাদেরকেও ধ্বংস ও পতনের ঝঞ্ঝাবায়ু গ্রাস করবে।

৪. রিয়া ছওয়াব থেকে মাহরূম করে :

রিয়ার কারণে আমলকারী পরকালে আমলের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। উবাই বিন কা‘ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَشِّرْ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ بِالتَّيْسِيرِ، وَالسَّنَاءِ، وَالرِّفْعَةِ بِالدِّينِ، وَالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ، وَالنَّصْرِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا ، فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. ‘এই উম্মতকে সহজতা, দ্বীনের মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা ও সম্মান, পৃথিবীতে রাজত্ব কায়েম এবং বিজয়ের সুসংবাদ দাও। সুতরাং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আখিরাতের কাজ পার্থিব স্বার্থে সম্পাদন করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ বা প্রাপ্য থাকবে না’।[১১]

৫. রিয়া ভ্রষ্টতা বৃদ্ধি করে :

আল্লাহ মুনাফিকদের দ্বিমুখী আচরণ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলেছেন, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ- فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ‘তারা আল্লাহ ও ঈমানদারগণের সাথে প্রতারণা করে। অথচ এর মাধ্যমে তারা কেবল নিজেদের সাথেই প্রতারণা করে। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনা। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি তাদের মিথ্যাচারের কারণে’ *(বাক্বারাহ ২/৯-১০)*।

৬. রিয়াকারের পরিশ্রম ব্যর্থ :

হাদীছে এসেছে, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا شَيْءَ لَهُ. فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: لَا شَيْءَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ. ‘একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, এক ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশায় ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের মানসে যুদ্ধ করে। তার জন্য কী প্রতিদান রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তার জন্য কিছুই নেই’। লোকটি একই প্রশ্ন তিনবার পুনরাবৃত্তি করল আর প্রতিবারই রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তার জন্য কিছুই নেই’। এরপর তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা সেটুকু আমলই কবুল করেন, যা একনিষ্ঠতার সাথে একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যই করা হয়’।[১২]

৭. দুনিয়াবী ক্ষতি :

রিয়াকারী নিজেই নিজের ক্ষতি করছে, এমনকি দুনিয়াবীও। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, فَلَوْ عَلِمَ الْمُرَائِي أَنَّ قُلُوبَ الَّذِينَ يُرَائِيهِمْ بِيَدِ مَنْ يَعْصِيهِ، لَمَا فَعَلَ. ‘যদি রিয়াকারী জানত যে, সে যাদেরকে দেখানোর জন্য আমল করে, তাদের অন্তরও সেই সত্তার হাতে, যার অবাধ্যতা সে করছে (অর্থাৎ আল্লাহ্র হাতে), তাহলে সে কখনো এমন কাজ করত না’।[১৩]

সুতরাং যারা মানুষকে দেখাতে চায়, মানুষের কাছে মর্যাদা অর্জন করতে চায় এবং মানুষের সন্তুষ্টিতে নিজের সফলতা

---

[৯] *নাসাঈ হা/৩১৭৮; ছহীহ তারগীব হা/৬১।*

[১০] *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৮৮।*

[১১] *ছহীহ তারগীব হা/২৩, ১৩৩২।*

[১২] *নাসাঈ হা/৩১৪০; সিলসিলা ছহীহা হা/৫২।*

[১৩] *ছায়দুল খাতির, পৃ. ৩৯৩।*

খোঁজে তারা যেন রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ দু'টি গভীরভাবে অনুধাবন করে- مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ؛ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ. 'যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন এবং মানুষকেও তার উপর ক্রুদ্ধ করে দেন'।[১৪]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤُونَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. 'যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের দুশ্চিন্তা ও নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোর্পদ করে দেন'।[১৫]

৮. রিয়ার কারণে মানুষের অন্তর থেকে ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ অপসৃত হয় :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. 'আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান দেওয়ার কেউ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তাই-ই করেন' *(হজ্জ ২২/১৮)*। একমাত্র মহান আল্লাহই মানুষের হৃদয়ে আপনার প্রতি ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রবেশ করাতে পারেন। আর তিনি অপমানিত করলে কেউ আপনার অন্তরে তাদের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করতে পারবে না। এজন্য ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, مَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. 'যদি কারো নিয়ত বিশুদ্ধ ও খাঁটি হয়, আল্লাহ তা'আলাই তার ও মানুষের মধ্যকার সব বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান'।[১৬] তিনি আরো বলেন, وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ شَانَهُ اللَّهُ. 'যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে অবিদ্যমান গুণ থাকার ভান করে নিজেকে অলংকৃত করতে চায়, আল্লাহ তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন'।

ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) ওমর (রাঃ)-এর উপরোক্ত উক্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নেই এমন গুণের ভান করে নিজেকে সাজায়, সে মূলত মুখলিছ বা নিষ্ঠাবান ব্যক্তির বিপরীত। কারণ সে মানুষের নিকট এমন কিছু প্রকাশ করে, অথচ তার অন্তরে থাকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই আল্লাহ তাকে তার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল দেন। কারণ উদ্দেশ্যের বিপরীত দিয়ে শাস্তি দেওয়া শরী'আত ও তাকদীর উভয় দিক থেকেই প্রতিষ্ঠিত একটি নীতি (فَإِنَّ الْمُعَاقَبَةَ بِنَقِيضِ الْقَصْدِ ثَابِتَةٌ شَرْعًا وَقَدَرًا)।

মুখলিছ ব্যক্তি তার ইখলাছ বা আন্তরিকতার ফলস্বরূপ দ্রুতই মানুষের হৃদয়ে মাধুর্য, ভালোবাসা ও ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা লাভ করে; তেমনি যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নেই এমন গুণের ভান করে আল্লাহ তার শাস্তি দ্রুতই এভাবে দেন যে, মানুষের মাঝে তাকে অপমানিত ও অপদস্থ করে দেন। কারণ সে আল্লাহ্র কাছে নিজের অন্তরকে কলুষিত করেছে। আর এটি আল্লাহ্র সুন্দর নামসমূহ, মহান গুণাবলী এবং তার ফায়ছালা ও শরী'আতের প্রজ্ঞারই একটি প্রকাশ।

আরো কারণ হ'ল, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে বিদ্যমান নেই এমন গুণ প্রকাশের ভান করে যেমন বিনয়-নম্রতা, দ্বীনদারী, ইবাদত, ইলম ইত্যাদি, সে আসলে নিজেকেই এসব গুণের দাবী ও দায়িত্বের সামনে দাঁড় করায়। ফলে মানুষও স্বাভাবিকভাবেই তার কাছ থেকে এসব গুণের বাস্তব প্রকাশ প্রত্যাশা করবে। কিন্তু যখন তার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে না, তখন সে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ হবে। এভাবেই যে জিনিস দিয়ে সে নিজেকে সাজাতে চেয়েছিল, সেটিই তার লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে'।[১৭]

৯. পরকালে রিয়ার কঠিন শাস্তি :

রিয়া আখিরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম শহীদের বিচার করা হবে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে আল্লাহ্র নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে সে তা স্বীকার করে নেবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, 'এ নে'মতের শুকরিয়া স্বরূপ তুমি কি আমল করেছ'? সে বলবে, আমি আপনার পথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছ। লোকে তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে এ উদ্দেশ্যে তুমি জিহাদ করেছ। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে উপুড় করে মুখের উপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর বিচার করা হবে এমন এক ব্যক্তির, যে ইলম শিখেছে, মানুষকে ইলম শিখিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে এনে আল্লাহ্র নে'মতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে এবং সে তা স্বীকার করে নেবে। এরপর আল্লাহ বলবেন, 'তুমি এ নে'মতের শুকরিয়া স্বরূপ কী আমল করেছ'? সে বলবে, 'আমি আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম শিখেছি, ইলম শিখিয়েছি ও কুরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি ইলম শিখেছ, লোকে তোমাকে আলেম বলবে তাই। তুমি কুরআন তেলাওয়াত করেছ লোকে যেন তোমাকে

---

[১৪] *ছহীহ তারগীব হা/২২৫০।*

[১৫] *তিরমিযী হা/২৪১৪, হাদীছ ছহীহ।*

[১৬] *ইবনুল মুবাররাদ, মাহযুছ ছওয়াব ফী ফাযায়েলে আমীরিল মুমিনীন ওমার ইবনিল খাত্ত্বাব, ২/৫৪৯।।*

[১৭] *ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১২৩ 'বিচারকার্যে ওমরের পত্র ও তার ব্যাখ্যা'।*

সূচীপত্র

ক্বারী বলে। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হলে তাকে উপুড় করে মুখের ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর বিচার করা হবে এমন এক ব্যক্তির, যাকে আল্লাহ স্বচ্ছলতা দিয়েছেন ও সকল প্রকার সম্পদ দান করেছেন। তাকে আনার পর আল্লাহ্র নে'মত স্মরণ করিয়ে দিলে সে তা স্বীকার করে নিবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি এ নে'মতের শুকরিয়া স্বরূপ কী আমল করেছ? সে বলবে, 'আপনার পছন্দনীয় প্রতিটি খাতেই আমি সম্পদ ব্যয় করেছি'। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, বরং তুমি এজন্য দান করেছ যে, লোকে তোমাকে দানশীল বলবে। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হলে তাকে উপুড় করে মুখের ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৮]

মু'আবিয়া (রাঃ) হাদীছটি শুনে ক্রন্দন করেন এবং তেলাওয়াত করতে থাকেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ –أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে, আমরা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই পূর্ণভাবে দিয়ে দিব। সেখানে তাদের কোনই কমতি করা হবে না। এরা হ'ল সেইসব লোক যাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই। দুনিয়াতে তারা যা কিছু (সৎকর্ম) করেছিল আখিরাতে তা সবটাই বরবাদ হবে এবং যা কিছু উপার্জন তারা করেছিল সবটুকুই বিনষ্ট হবে' *(হূদ ১১/১৫-১৬)*।[১৯]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'নবী (ছাঃ) গাযী, আলেম ও দানশীল ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন- যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এসব আমল করেছে এবং এ কারণে তাদেরকে শাস্তি প্রদান ও জাহান্নামে প্রবেশ করানোর কথা বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, রিয়া কতটা গুরুতর ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর এর শাস্তিও অত্যন্ত ভয়াবহ। একই সাথে এটি আমলের ক্ষেত্রে ইখলাছ অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে'।[২০]

১০. রিয়াকারী অন্যকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচালেও নিজেই ডুবে যায় :

আলেম, দাঈ বা সমাজ সংস্কারক যখন রিয়াকারী হয়, তখন তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচান; কিন্তু রিয়ার কারণে তিনি নিজেই সেই হুতাশনে নিপতিত হন। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ. 'তোমরা আলেমদের উপর গর্ব করার জন্য অথবা মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষের দৃষ্টি তোমাদের দিকে আকর্ষণ করার জন্য ইলম অর্জন করো না। যে ব্যক্তি এসব উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করবে, সে জাহান্নামে যাবে'।[২১]

১১. কিয়ামত দিবসের আক্ষেপ :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. قَالَ: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً. 'আমি তোমাদের জন্য যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হল ছোট শিরক। ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, রিয়া। কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে আল্লাহ তাদের আমলের প্রতিদান দিবেন, তখন তিনি রিয়াকারীদের বলবেন, তোমরা তাদের কাছে যাও যাদের দেখানোর জন্য দুনিয়াতে আমল করতে। দেখো, তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কি-না'?[২২]

একজন জ্ঞানী বলেছেন, যে ব্যক্তি লৌকিকতা ও শ্রুতির জন্য ইবাদত করে, তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যে বাজারে বের হয়ে তার থলি কংকর দিয়ে ভর্তি করে। তখন মানুষ বলে, 'লোকটির থলি কত ভরা!' কিন্তু মানুষের এই মন্তব্য ছাড়া এতে তার কোনো ফায়েদা হয় না। সে যদি এর দ্বারা কিছু কিনতে চায়, কেউ তাকে কিছু দেবে না। তেমনি যে ব্যক্তি রিয়া ও খ্যাতির জন্য আমল করে, মানুষের প্রশংসা ছাড়া তার আমলের কোনো উপকার নেই এবং আখিরাতে তার কোনো ছওয়াবও নেই।[২৩]

১২. রিয়া লাঞ্ছনার কারণ :

রিয়া পরকালে লাঞ্ছনা, অপমান, অপদস্থতা ও হীনতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ. 'যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করে, আল্লাহ তার একথা কিয়ামতের দিন সৃষ্টিকুলের সামনে শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তার ঐ কাজ সবাইকে দেখিয়ে দিবেন'।[২৪]

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, مَعْنَاهُ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا عَلَى غَيْرِ إِخْلَاصٍ؛ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَيَسْمَعُوهُ، جُوزِيَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يُشَهِّرَهُ اللَّهُ وَيَفْضَحَهُ، وَيُظْهِرَ مَا كَانَ يُبْطِنُهُ 'এর

---

[১৮] মুসলিম হা/১৯০৫ ।

[১৯] ফাতহুল বারী ১১/৩১৫, ৬৪৪৩ নং হাদীছের আলোচনা দ্রঃ।

[২০] আল-মিনহাজ শারহু ছহীহ মুসলিম ১৩/৫০।

[২১] ইবনু মাজাহ হা/২১০, হাসান।

[২২] আহমাদ হা/২৩৬৮০; ছহীহুল জামে হা/১৫৫৫।

[২৩] ড. খালিদ আবূ শাদী, দা ওয়া দাওয়া, পৃ. ৬৯।

[২৪] বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬, ৭১৫২।

সূচীপত্র

অর্থ হল, যে ব্যক্তি কোনো কাজ একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা ছাড়া করে; বরং সে চায় মানুষ তাকে দেখুক ও তার কথা শুনুক, তাকে সেই কাজের প্রতিদান এভাবে দেওয়া হবে যে, আল্লাহ তাকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন ও লাঞ্ছিত-অপমানিত করবেন এবং সে যা অন্তরে গোপন রেখেছিল তা প্রকাশ করে দেবেন’।[২৫]

ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, ‘কয়েকটি হাদীছে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, রিয়াকারীর আমলের স্বরূপ উন্মোচন ও শোনানোর বিষয়টি কিয়ামতের দিন ঘটবে। এটিই গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মত’।[২৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ مَسَامِعَ خَلْقِهِ، وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ. ‘যে ব্যক্তি তার আমলের কথা মানুষকে শুনিয়ে বেড়ায়, আল্লাহ তা সৃষ্টিকুলের সামনে শুনিয়ে দিবেন এবং তাকে মানুষের কাছে ছোট ও তুচ্ছ করে দিবেন’।[২৭]

১৩. রিয়া নেক আমলকে বরবাদ করে দেয় :

রিয়া নেক আমলের জন্য অনেক বড় বিপদ। কেননা তা আমলকে নষ্ট করে দেয় এবং এর বরকত দূর করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করোনা। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করেনা। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ’ল ও তাকে ধুয়ে ছাফ করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা উপার্জন করে, তা থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’*(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।

এই কঠিন হৃদয়, যা রিয়ার (লোক দেখানো আমলের) আবরণে ঢাকা। এর উদাহরণ একটি মসৃণ পাথরের মতো, যার উপর সামান্য মাটি জমে থাকে। কিন্তু আসলে তা এমন এক পাথর যেখানে কোনো উর্বরতা নেই, কোনো কোমলতাও নেই। এর উপর হালকা মাটির আস্তরণ থাকে, যা প্রতারিত চোখের কাছ থেকে তার কঠোরতাকে গোপন করে রাখে, যেমন রিয়া ঈমানশূন্য হৃদয়ের কঠোরতাকে আড়াল করে রাখে। কিন্তু যখন প্রবল বৃষ্টি আসে, তখন সেই সামান্য মাটিও ধুয়ে যায়। তখন তার অন্তরে লুক্কায়িত ত্রুটি প্রকাশ হয়ে যায় এবং তার হৃদয়ের রুক্ষতা ও কঠোরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন সেখানে কোনো শস্য জন্মায় না, কোনো ফলও ধরে না। কারণ তা তো নিকৃষ্ট বৃক্ষের মতো, যা মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে–যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

এরূপই সেই ব্যক্তি, যে লোক দেখানোর জন্য কাজ করে। সে কোনো কল্যাণের ফল পায় না এবং কোনো ছওয়াব অর্জন করে না। বরং সে পরকালে এমন এক বড় অপরাধ নিয়ে আসে, যার পরিণতি অত্যন্ত মন্দ। সেদিন কোনো সম্পদ বা সন্তান কোনো উপকারে আসবে না। তবে কেবল সেই ব্যক্তি উপকৃত হবে, যে আল্লাহর কাছে সুস্থ ও নির্মল হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হবে।

এটাই হল রিয়ার পরিণাম, যা সৎকর্মসমূহকে এমন সময়ে একেবারে বরবাদ করে ছেড়ে দেয়, যখন মানুষের কোন শক্তি থাকবে না, কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং সে এর কোন প্রতিকারও করতে পারবে না।[২৮]

মহান আল্লাহ বলেন, أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ‘তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুর বাগান থাকবে। যার নীচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। যে বাগানে সব ধরনের ফল-ফলাদি থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হবে এবং তার দুর্বল সন্তানাদি রয়েছে। এমতাবস্থায় তার বাগানে অগ্নিঝড় আঘাত হানলো, যাতে সবকিছু পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল? এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৬)*। সৎকর্মসমূহ অধিক ফল-ফসলে সমৃদ্ধ একটি বিশাল বাগানের মতো। কাজেই এমন কেউ আছে কি, যে এই ফল-ফসলসহ বাগানটি তার হৌক তা কামনা করবে। এরপর সেই বাগানে রিয়া সদৃশ ঘূর্ণিঝড় এসে বাগানটিকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিবে, অথচ বাগানটি তার খুবই প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে কেউ তা চাইবে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, قال اللهُ تعالَى : أنا أغْنَى الشُّركاءِ عنِ الشِّركِ ، مَنْ عمِلَ عملًا أشركَ فيه معِي تركتُهُ وشِركَهُ ‘আল্লাহ বলেন, আমি শরীকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি কোন ব্যক্তি কোন আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, তবে আমি তাকে তার শিরকপূর্ণ আমলসহ পরিত্যাগ করি’।[২৯]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى

---

[২৫] ফাতহুল বারী ১১/৪০৯, হা/৬৪৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
[২৬] ফাতহুল বারী ১১/৪০৯।
[২৭] আহমাদ হা/৬৫০৯; ছহীহ তারগীব হা/২৫।

[২৮] সালীম আল-হেলালী, আর-রিয়া, পৃ.৪৬।
[২৯] মুসলিম হা/২৯৮৫।

الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. ‘আল্লাহ যখন কিয়ামতের দিনে, যে দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, সকল মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য সম্পাদিত আমলের মধ্যে কাউকে শরীক করেছে, সে যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে নিজের ছওয়াব চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ শরীককারীদের শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত’।[৩০]

১৪. রিয়া হল গোপন শিরক :

মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন বের হয়ে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ. ‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকো। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গোপন শিরক কী? তিনি বললেন, ‘একজন ছালাতে দাঁড়ায়, এরপর যখন দেখে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে তার ছালাতকে সুন্দর ও দীর্ঘ করার জন্য খুব চেষ্টা করে। আর এটাই হল গোপন শিরক’।[৩১] অন্য হাদীছে রিয়াকে ছোট শিরক (الشرك الأصغر) বলা হয়েছে।[৩২]

শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) বলেন, كُنَّا نَعُدُّ الرِّيَاءَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ ‘আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত)-কে ছোট শিরক গণ্য করতাম’।[৩৩]

শিরক দুই প্রকার। ১. খফী বা গোপন ২. জলী বা প্রকাশ্য। প্রকাশ্য শিরক হল যা কথার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা বা একথা বলা যে, مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ‘আল্লাহ ও তুমি যা চাও’। অথবা কাজের মাধ্যমে হতে পারে। যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্মানার্থে নত হওয়া বা মাথা ঝুঁকানো। আর গোপন শিরক হল, যা মানুষের অন্তরে থাকে। যেমন রিয়া। কেননা তা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় না। কারণ অন্তরের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এটাকে গোপন শিরকও বলা হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ‘যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে’ *(তারেক ৮৬/৯)*। কেননা অন্তরের গোপন বিষয়ের উপরই কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ- وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ‘সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে? এবং বুকের মধ্যে যা লুকানো ছিল সব প্রকাশিত হবে?’ *(আদিয়াত ১০০/৯-১০)*।[৩৪]

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-গুনায়মান বলেন, ‘রিয়াকে গোপন শিরক (شرك السرائر) বলা হয়। কারণ এটি এমন এক গোপন বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এটি মানুষের নিয়তের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। আর নিয়তই মানুষকে কর্মের প্রেরণা যোগায়। নিয়তের স্থান হলো হৃদয়, যা সব আমলের উৎসভূমি। কারণ হৃদয় অঙ্গসমূহের রাজা। কোনো কাজ মূলত নিয়তের উপর নির্ভর করে সংঘটিত হয়। তাই নিয়ত এমন এক গোপন বিষয়, যা কেবল সেই সত্তাই জানেন যিনি সব গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত। তিনি হলেন মহিমান্বিত আল্লাহ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি রিয়া (লোক দেখানো কাজ) করে, মানুষের কাছে তার কর্ম গোপন থাকে না। এজন্য অনেক মানুষ তাকে চিনে ফেলে, এমনকি বলা হয়, এ ব্যক্তি রিয়াকার। যদিও সে নিজে তা প্রকাশ বা প্রচার না করে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তার কাজ ও কথার প্রভাবের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করে দেন। তার কথা বলার ভঙ্গি ও কাজের ধরনের মধ্যেও তা প্রকাশ পায়। কখনো এর সামান্য অংশ প্রকাশ পায়, আর অধিকাংশই গোপন থেকে যায়। তবে মানুষের কর্তব্য হ’ল, সে যেন তার রবের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে এবং তার কাজে মানুষের জন্য কোনো মূল্য বা অংশ না রাখে’।[৩৫] এজন্য আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আল্লাহ্র কাছে এই মর্মে দো‘আ করতেন, اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার সমস্ত আমলকে সৎ আমলে পরিণত করো, সে আমলগুলোকে তোমার সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি করে দাও এবং তোমার কোনো সৃষ্টির জন্য এতে কোনো অংশ রেখো না’।[৩৬]

আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়েদ বলেন, আমি হাসান বাছরীকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে রিয়া সম্পর্কে বলুন, এটি কি শিরক? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে বৎস! তুমি কি কুরআন মাজীদের এই আয়াত পড় না- فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ‘অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে’ *(কাহফ ১৮/১১০)*।[৩৭]

পরিশেষে বলা যায়, গোপন শিরক রিয়া দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে ভয়াবহ ক্ষতি ও লাঞ্ছনার কারণ। কাজেই ইখলাছের বর্মে সুসজ্জিত হওয়ার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

---

৩০. তিরমিযী হা/৩১৫৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২০৩।
৩১. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৯৩৭; ছহীহ তারগীব হা/৩১।
৩২. আহমাদ হা/২৩৬৮০; ছহীহ তারগীব হা/৩২।
৩৩. ছহীহ তারগীব হা/৩৫।
৩৪. আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ, পৃ. ৪৫৪।
৩৫. https://shamela.ws/book/37166/1302
৩৬. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১/৩৩৪।
৩৭. আদ-দুররুল মানছূর ৫/৪৭০।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ : আত্মশুদ্ধির সোপান ও প্রশান্তির চাবিকাঠি

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

রাগ বা ক্রোধ মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আনন্দ, কষ্ট বা ভয়ের মতোই এটি আমাদের অস্তিত্বের একটি অংশ। কিন্তু যখন এই আবেগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন তা এক ভয়ংকর দাবানলে পরিণত হয়। এটি মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হ'লেও, শয়তান একে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে মানুষকে ক্ষণিকের জন্য বিবেকশুন্য করে দেয় এবং তার নেক আমল বিনষ্ট করে। অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ কেবল মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রশান্তিই কেড়ে নেয় না, বরং সুন্দর সম্পর্কগুলোকেও নিমেষেই ধ্বংস করে দেয়। শরী'আতে ক্রোধকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার কথা বলা হয়নি, বরং এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক পথে পরিচালিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব, উপকারিতা, পদ্ধতি এবং ক্রোধের লাগাম টেনে ধরতে ব্যর্থ হ'লে জীবনে কী কী নেতিবাচক পরিণতি নেমে আসতে পারে সে ব্যাপারে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য :

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাগ নিয়ন্ত্রণের কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ 'যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) ব্যয় করে, রাগ নিয়ন্ত্রণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে' *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*। অন্যত্র তিনি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 'যখন তারা ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে' *(শূরা ৪২/৩৭)*।

কুরআনের এই আয়াত দু'টি প্রমাণ করে যে, রাগের মুহূর্তে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করা এবং ক্ষমা করে দেওয়া মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ্‌র নিকটে অত্যন্ত প্রিয় আমল।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারীদের অসামান্য পুরস্কার :

যে ব্যক্তি রাগের সময় প্রতিশোধ নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে গুটিয়ে নেয়, তার জন্য রাসূল (ছাঃ) অভাবনীয় পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ 'যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সংযত থাকে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে ডেকে নিবেন এবং তাকে হূরদের মধ্য হ'তে তার পসন্দমত যে কোন একজনকে বেছে নিতে বলবেন'।[1]

তিনি বলেন, مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ، مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ 'কোন বান্দা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্রোধের ঢোক গলধঃকরণ (সংবরণ) করলে, আল্লাহ্‌র নিকট ছওয়াবের দিক থেকে তার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কোন ঢোক আর নেই'।[2]

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী কোন তর্কে বা ঝগড়ায় জিতে যাওয়া হয়তো আমাদের সাময়িক অহংকারকে তৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু আখেরাতের অনন্তকালের সেই অভাবনীয় সম্মান ও পুরস্কারের তুলনায় তা একেবারেই তুচ্ছ।

জান্নাত লাভের সবচেয়ে মূল্যবান ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ :

একবার এক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন; আমার জন্য যেন তা বেশী না হয়ে যায়। আমি যেন তা সহজে মনে রাখতে পারি। তিনি বললেন, রাগ করো না। লোকটি তার প্রশ্ন কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলো। প্রতিবারই রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'রাগ করো না'।[3] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) কে এসে বললেন, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ 'রাগ করবে না, তাহলেই তোমার জন্য জান্নাত।[4]

এই ছোট্ট একটি বাক্য আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। হ'তে পারে জান্নাত লাভের অন্যতম কারণ। ভেবে দেখুন তো! আমাদের জীবনের বেশিরভাগ অনুশোচনা, ভাঙা সম্পর্ক এবং ভুল সিদ্ধান্তের পেছনে এই 'রাগ'ই দায়ী থাকে কি না?

রাব্বুল 'আলামীনের ক্রোধ থেকে বাঁচার মাধ্যম :

জনৈক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে এসে বললেন, কোন কাজটি আমাকে মহান প্রতিপালকের ক্রোধ থেকে দূরে রাখবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি রাগ করো না।[5] অতএব আমরা যদি চাই যে দয়াময় আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি বা অন্যায়ের ব্যাপারে ক্রুদ্ধ না হয়ে ক্ষমা করে দিন, তাহ'লে আমাদেরও উচিত মানুষের অন্যায়ের প্রতি সম্ভবপর ক্রুদ্ধ না হয়ে ক্ষমা করে দেওয়া। যে ব্যক্তি নিজের রাগকে দমন করে মানুষের প্রতি দয়াশীল হয়, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি নিজের ক্রোধকে প্রশমিত করে তাকে পরম করুণায় সিক্ত করেন।

প্রকৃত বীরত্বের মাপকাঠি :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ 'প্রকৃত বীর বা শক্তিশালী সে নয়,

---

[1] *আবুদাঊদ হা/৪৭৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৬; মিশকাত হা/৫০৮৮।*
[2] *ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৯; আহমাদ হা/৬১১৪; মিশকাত হা/৫১১৬।*
[3] *বুখারী হা/৬১১৬; তিরমিযী হা/২০২০, মিশকাত হা/৫১০৪।*
[4] *তাবারাণী আওসাত্ব হা/২৩৫৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪৯।*
[5] *আহমাদ, ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪৭।*

যে কুস্তিতে অন্যকে হারিয়ে দেয়। বরং প্রকৃত বীর সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে’।[৬]

একদিন রাসূল (ছাঃ) এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা কুস্তি লড়ছিল। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হ’ল, অমুক ব্যক্তি একজন বড় কুস্তিগীর, যে-ই তার সাথে লড়তে আসে, তাকেই সে হারিয়ে দেয়! তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তার চেয়েও শক্তিশালী ব্যক্তির কথা বলে দেব না? رَجُلٌ ظَلَمَهُ رَجُلٌ فَكَظَمَ غَيْظَهُ فَغَلَبَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانَ صاحبه ‘সে হ’ল ওই ব্যক্তি, যার প্রতি কেউ অবিচার করল, কিন্তু সে নিজের রাগ হজম করে নিল এবং এর মাধ্যমে সে নিজেকে জয় করল, তার শয়তানকে হারাল এবং তার সঙ্গীর (প্রতিপক্ষের) শয়তানকেও পরাজিত করল’।

এ হাদীছ দু’টি আমাদেরকে যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা দেয় তা হ’ল, পেশিশক্তির আস্ফালন কেবল একটি বাহ্যিক ক্ষমতা, কিন্তু ভেতরের ক্রোধের দাবানলকে প্রশমিত করে নিজেকে শান্ত রাখার যে আত্মিক শক্তি, তা-ই একজন মানুষকে সত্যিকারের অপরাজেয় করে তোলে। রাগের বশবর্তী হয়ে ধ্বংসাত্মক বা ভুল কিছু করে ফেলা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু ক্ষোভের তীব্র ঝড়ের মুখে অটল থেকে ধৈর্য ও আত্মসংযমের পথ বেছে নেওয়াই হ’ল প্রকৃত বীরত্ব।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা

বলা হয়ে থাকে যে, রাগ হ’ল এমন একটি জ্বলন্ত কয়লার মতো, যা অন্যের দিকে ছুঁড়ে মারার উদ্দেশ্যে নিজ হাতে তুলে নেয়া হয়; কিন্তু এতে সবার আগে নিজের হাতই পুড়ে যায়। ক্রোধকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব নয়, তবে একে সঠিকভাবে পরিচালনা করা বা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে জীবনে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব।

১. শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি : রাগ সরাসরি আমাদের শরীরের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখলে শরীর বিভিন্ন মারাত্মক রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়। অতিরিক্ত রাগের সময় রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়, যা দীর্ঘমেয়াদে স্ট্রোকের ঝুঁকি তৈরি করে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে।

ক্ষোভ ও রাগ পুষে রাখলে মস্তিষ্কে অস্থিরতা কাজ করে, যার ফলে অনিদ্রা দেখা দেয়। ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি ও সুন্দর নিদ্রা নিশ্চিত হয়।

২. মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায় : ক্রোধ কেবল শরীর নয়, মনেরও ব্যাপক ক্ষতি করে। মানসিক সুস্থতার জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ জাদুর মতো কাজ করে। রাগের কারণে প্রতিনিয়ত মানসিক চাপ তৈরি হয়, যা একসময় বিষণ্ণতা বা উদ্বেগে রূপ নেয়। রাগ দমন করতে পারলে মন অনেক বেশি প্রফুল্ল ও চিন্তামুক্ত থাকে এবং যেকোন কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে স্থির রাখার ক্ষমতা তৈরি হয়।

৩. সম্পর্ক সুন্দর ও সুদৃঢ় হয় : পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অশান্তির অন্যতম মূল কারণ হ’ল অনিয়ন্ত্রিত রাগ। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে প্রিয়জনদের সাথে অহেতুক ঝগড়া ও ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো সম্ভব হয়।

৪. আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি : চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও যিনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন, তার ব্যক্তিত্বে গাম্ভীর্য ও মাধুর্য ফুটে ওঠে। মানুষ তার ওপর আস্থা রাখে এবং তাকে ভরসার জায়গা মনে করে। শান্তভাবে এবং যুক্তি দিয়ে কথা বলার মাধ্যমে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পায়। কেউ যখন অন্যের ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে, তখন সমাজেও তার প্রতি মানুষের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৫. পেশাগত জীবনে সাফল্যের সোপান : কর্মক্ষেত্রে সফলতার জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ একটি অপরিহার্য গুণ। কারণ রাগ মানুষের যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। রাগের বশবর্তী হয়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুল হয়। রাগ নিয়ন্ত্রণে থাকলে মাথা ঠান্ডা রেখে বস্তুনিষ্ঠ ও গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

অন্যদিকে, শান্ত ও ধৈর্যশীল মানুষেরা যেকোন দলের জন্য সম্পদ। একজন রগচটা মানুষের সাথে কেউ কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। সহনশীলতা কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করে এবং ক্যারিয়ারে সফলতার পথ সুগম করে।

৬. শত্রুর সম্মান অর্জন ও মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহতকরণ : রাগ নিয়ন্ত্রণের সুন্দর আরেকটি দিক হ’ল, এটি শত্রুকেও পরম বন্ধুতে পরিণত করতে পারে। অপসন্দনীয় কাজ ও কঠোরতার জবাব যদি ভালো আচরণ, কোমলতা এবং ক্ষমা দিয়ে দেয়া হয়, তবে তা মুহূর্তের মধ্যে মানুষের হৃদয়কে জয় করে নেয়।

আল্লাহ তা‘আলা অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই নীতির কথা তুলে ধরে বলেছেন, ‘ভাল ও মন্দ কখনো সমান নয়। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর উত্তম দ্বারা। ফলে তুমি দেখবে যে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে। এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ’তে পারে, যারা ধৈর্যশীল এবং যারা মহাভাগ্যবান *(ফুছছিলাত ৪১/৩৪-৩৫)*।

এই আয়াতের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘এর অর্থ হ’ল রাগের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। মানুষ যখন এই গুণটি অর্জন করে, তখন তাদের শত্রুরাও তাদের কাছে নমনীয় হয়ে যায়। যেন সে তাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু’ *(তাফসীর ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। অর্থাৎ ক্রোধ সংবরণ কেবল আত্মনিয়ন্ত্রণই নয়; এটি এমন একটি অসাধারণ হাতিয়ার, যার মাধ্যমে মন্দের জবাব ভালো দিয়ে এবং কঠোরতাকে কোমলতা দিয়ে জয় করা যায়। এর ফলে শত্রুতা দূর হয় এবং সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের নববী পদ্ধতি

রাসূল (ছাঃ) কেবল রাগ নিয়ন্ত্রণের তাত্ত্বিক জ্ঞানই দেননি, রাগ উঠলে তাৎক্ষণিক কী করতে হবে, তার অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও আধ্যাত্মিক সমাধানও দিয়ে গেছেন-

---

[৬] *বুখারী হা/৬১১৪; মিশকাত হা/৫১০৫।*

সূচীপত্র

১. আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা : রাগের উৎপত্তি হয় শয়তানের প্ররোচনা থেকে। তাই রাগ উঠলে পড়তে হবে *‘আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম’* (আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। একবার রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এক ব্যক্তি ভীষণ রাগান্বিত হয়ে অপরজনকে গালি দিচ্ছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি একটি কালেমা জানি, যদি লোকটি তা পড়তো, তা হ’লে তার ক্রোধ চলে যেত। সেটি হ’ল *‘আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম’*।[৭]

২. চুপ হয়ে যাওয়া : রাগের মাথায় মানুষ এমন কথা বলে ফেলে, যার জন্য পরে সারা জীবন অনুশোচনায় ভুগতে হয়। তাই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ ‘তোমাদের কেউ রাগান্বিত হয়ে গেলে, সে যেন চুপ থাকে’।[৮]

৩. অবস্থান পরিবর্তন করা : রাগের সময় মানুষের শারীরিক উত্তেজনা বেড়ে যায়। তাই এসময় নিজের অবস্থার পরিবর্তন করা অত্যন্ত কার্যকর সমাধান। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ ‘তোমাদের কারো যদি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তবে সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি রাগ দূর হয়ে যায় ভালো, অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে’।[৯]

আরো কিছু কার্যকর পদ্ধতি

১. বিরতি গ্রহণ করুন!

রাগের মুহূর্তে আমাদের মস্তিষ্ক যুক্তির চেয়ে আবেগের দ্বারা বেশি পরিচালিত হয়। তাই যখনই বুঝবেন ভেতরে রাগের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতরের ‘পজ বাটন’টি চেপে দিন। অর্থাৎ তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না বা কোন কথা বলবেন না। এই ছোট্ট বিরতি আপনার মস্তিষ্ককে রাগের আবেগ থেকে যুক্তির দিকে ফিরে আসার সুযোগ দিবে ইনশাআল্লাহ। এই সময়ে মনে মনে *ইস্তেগফার করতে* পারেন। এই সামান্য সময়টুকু একটি বড় ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারে।

২. ওযূ করুন!

এটি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের একটি চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক কৌশল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রাগের সময় শরীরে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং স্নায়ুবিক উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় শীতল পানি দিয়ে ওযূ করলে বা পানি পান করলে শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়, রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয় এবং মস্তিষ্কে শীতলতার পরশ লাগে। ফলে তাৎক্ষণিক উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং মানুষ হিতাহিত জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভুল সিদ্ধান্ত বা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

৩. গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন করুন!

রাগ হ’লে আমাদের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়। এই শারীরিক প্রতিক্রিয়া কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হ’ল গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া। চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে লম্বা শ্বাস নিন, কিছুক্ষণ আটকে রাখুন এবং ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে ছেড়ে দিন। এটি আপনার স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে এবং মনের ভেতরে জমে থাকা উত্তেজনা নিমেষেই কমিয়ে দেয়।

৪. ‘তুমি’-এর বদলে ‘আমি’ দিয়ে বাক্য শুরু করুন!

রাগের সময় আমরা অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ি এবং অন্যকে দোষারোপ করতে থাকি। ‘তুমি সবসময় এমন কর’ না বলে ‘কাজটি এভাবে হওয়ায় আমি কষ্ট পেয়েছি’ এমনভাবে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টা করুন। অভিযোগের সুরে কথা না বলে, গঠনমূলকভাবে নিজের প্রত্যাশার কথা জানালে সম্পর্কগুলো অনেক বেশি সুরক্ষিত থাকে। এতে অপরদিকের মানুষটিও দায় এড়ানোর চেষ্টা না করে আপনার কথা বোঝার চেষ্টা করবে।

৫. ক্ষমা করতে অভ্যস্ত হৌন!

রাগকে পুষে রাখার অর্থ নিজের ভেতরে একটি বিষাক্ত কাঁটা জমিয়ে রাখা, যা দিন দিন আপনাকেই ক্ষতবিক্ষত করবে। তাই নিজের মনের শান্তির জন্যই অপরকে ক্ষমা করে দিতে শিখুন। যিনি ক্ষমা করতে পারেন, তার অন্তর সবচেয়ে বেশি প্রশান্ত থাকে। মনে রাখবেন রাগ দমন করা মানে নিজের অনুভূতিকে অস্বীকার করা নয় বা হেরে যাওয়া নয়; বরং এটি হ’ল নিজের ওপর চূড়ান্ত বিজয়ের প্রকাশ। যে মানুষ নিজের রাগকে শাসন করতে পারে, সে পৃথিবীর যেকোন কঠিন পরিস্থিতিকেই নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার যোগ্যতা রাখে।

৬. শব্দ চয়নে সতর্ক হৌন এবং পরিণতি সম্পর্কে ভাবুন!

রাগের মাথায় বলা একটি রূঢ় শব্দও এমন গভীর ক্ষত তৈরি করতে পারে, যা সহজে শুকায় না। চারপাশের যেসব মানুষ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে বা যাদের আপনি পথ দেখান, আপনার একটি রাগান্বিত আচরণ তাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই কিছু বলার আগে এর পরিণতি সম্পর্কে ভাবুন। আপনার প্রশান্ত ও নিয়ন্ত্রিত আচরণ অন্যদের জন্যও আত্মনিয়ন্ত্রণের এক দারুণ অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে।

ক্রোধের বহুমাত্রিক ক্ষতিকর দিক

রাগ বা ক্রোধ মানুষের ভেতরের এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি, যার অগ্ন্যুৎপাত কেবল চারপাশের সৌন্দর্যকেই পুড়িয়ে ছাই করে না, বরং নিঃস্ব করে দেয় মানুষের নিজের সত্তাকেও।

১. বিবেকের সাময়িক মৃত্যু :

রাগের মুহূর্তে মানুষের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি হয়, তা হ’ল তার হিতাহিত জ্ঞান বা বিবেকের সাময়িক মৃত্যু। যখন ক্রোধের আগুন মস্তিষ্কে আঘাত হানে, তখন যুক্তি ও বুদ্ধির দরজাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ তখন নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এমন সব কথা বলে বা এমন সব কাজ করে

---

[৭] *বুখারী হা/৬১১৫; মিশকাত হা/২৪১৮।*

[৮] *আহমাদ হা/২১৩৬, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৭৫।*

[৯] *আবূদাঊদ হা/৪৭৮২, মিশকাত হা/৫১১৪।*

বসে, যা সে সুস্থ মস্তিষ্কে কখনো করার কথা ভাবতেও পারে না। রাগের বশবর্তী হয়ে নেওয়া একটি ভুল সিদ্ধান্ত সারাজীবনের কান্না ও অনুশোচনার কারণ হ'তে পারে। ক্ষণিকের এই উত্তেজনায় মানুষ মূলত নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সেকারণ জনৈক বিদ্বান বলেন, اَلْغَضَبُ أَوَّلُهُ جُنُونٌ وَآخِرُهُ نَدَمٌ 'অর্থাৎ রাগের শুরুটা হয় পাগলামি দিয়ে, আর এর শেষ হয় অনুশোচনা দিয়ে'। অন্যদিকে মন শান্ত থাকলে যেকোন কঠিন পরিস্থিতি বা সংকটের সমাধান অনেক সহজ ও গঠনমূলকভাবে করা সম্ভব হয়।

২. সম্পর্কের অপমৃত্যু :

একটি সুন্দর সম্পর্ক, বন্ধুত্ব বা পারিবারিক বন্ধন গড়ে তুলতে বছরের পর বছর সময় লাগে। কিন্তু তা ভেঙে চুরমার করে দিতে এক মুহূর্তের অন্ধ ক্রোধই যথেষ্ট। রাগের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক সময় এমন সব তীক্ষ্ণ ও নিষ্ঠুর কথা বলে ফেলি, যা হয়তো আমরা মন থেকে বিশ্বাসও করি না। কিন্তু একবার মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া শব্দ আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না।

৩. শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় :

বৈজ্ঞানিক গবেষণা মতে, অতিরিক্ত রাগ মানুষের শরীরে এক বিষাক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। এটি রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়, হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি করে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে দুর্বল করে ফেলে। রাগী মানুষ কখনো মানসিকভাবে শান্তিতে থাকতে পারে না; তার ভেতরটা সবসময় এক অজানা অস্থিরতা ও বিষণ্ণতায় পুড়তে থাকে।

৪. সাফল্যের পথে বড় বাধা :

কর্মক্ষেত্র হোক বা ব্যক্তিগত জীবন, রাগী মানুষ কখনো সুদূরপ্রসারী সাফল্য পায় না। সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে তার গ্রহণযোগ্যতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। মানুষ হয়তো তাদের ক্ষণিকের জন্য ভয় পায়, কিন্তু কখনো মন থেকে শ্রদ্ধা করে না। রাগের কারণে মানুষ তার চারপাশের বিশ্বস্ত সহযোগীদের হারায়, যা তাকে ধীরে ধীরে একাকীত্ব ও ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়।

শেষ কথা :

পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ হ'ল নিজের প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ। ক্ষণিকের রাগের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক সময় প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, ক্যারিয়ার ধ্বংস করি, এমনকি নিজের দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই বরবাদ করে ফেলি। রাগ করে হয়তো আমরা তাৎক্ষণিক একটি 'জয়' পেতে পারি, কিন্তু দিন শেষে আমাদের ভেতরে একবুক অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই আসুন, রাগের দাসত্ব না করে বরং রাগকে নিজের দাসে পরিণত করি। যে ব্যক্তি নিজের রাগকে জয় করতে পেরেছে, সে মূলত নিজের জীবনকেই জয় করেছে। এই ছোট্ট জীবনে রাগের আগুনে পুড়ে ছাই করার মতো সময় আমাদের নেই। যখনই বুকের ভেতর রাগের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠতে চাইবে, তখন মহান আল্লাহ্র সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করুন। ভাবুন, আপনার এই এক মুহূর্তের নীরবতা, আপনার এই একটুখানি ছাড় দেওয়া আপনাকে জান্নাতের কতটা কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে! রাব্বুল আলামীন আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
নরমাল ডেলিভারী ও বন্ধ্যাত্ব রোগে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
CMU (Special Training on TVS)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৭৬৭-৪২৪৬৪৬

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিকস)
বাড়ী নং ৬২১, শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : দুপুর ৩ টা - রাত্রি ৯ টা
সিরিয়ালের জন্য : ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

গোপন পাপ : ঈমান বিধ্বংসী এক নীরব ঘাতক

-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ

ভূমিকা :

মানুষের জীবন এক বৈচিত্র্যময় ক্যানভাসের মতো, যার কিছু অংশ জনসমক্ষে উন্মোচিত আর কিছু অংশ একান্তই ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। সমাজের সামনে আমরা নিজেদের যতটা মার্জিত ও আদর্শবান হিসাবে উপস্থাপন করি, নির্জনতার আঁধারে অনেক সময় সেই অবয়ব আমূল বদলে যায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে বান্দা যখন আল্লাহ্র উপস্থিতিকে ভুলে গিয়ে কোন গুনাহ বা পাপে লিপ্ত হয়, তখন সেটাকে গোপন পাপ বলা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই পাপকে নগণ্য মনে হ’লেও এর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি কেবল ব্যক্তির নৈতিক পতনই ঘটায় না, বরং অন্তরের প্রশান্তি ও ইবাদতের স্বাদ কেড়ে নেয়, হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে এবং পরকালীন জীবনে চরম লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ঈমানকে কলুষমুক্ত রাখা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনে গোপন পাপের ভয়াবহতা অনুধাবন করা প্রতিটি জান্নাতপিয়াসী মানুষের জন্য অপরিহার্য। অত্র প্রবন্ধে এই গোপন পাপের স্বরূপ এবং এর মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করা হ’ল।

গোপন পাপের স্বরূপ :

গোপন পাপ বলতে সেই সব পাপাচারকে বোঝায়, যা একজন ব্যক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে বা নির্জনে সম্পাদন করে। মূলত এটি অন্তরে আল্লাহ্র ভয়ে ঘাটতি থাকা এবং মহান আল্লাহকে মানুষের চেয়েও কম গুরুত্ব দেওয়ার নামান্তর। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে এই পাপের দুয়ার অবারিত হয়েছে। গোপন পাপ কেবল বাহ্যিক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানসিক ও যান্ত্রিক উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। কতিপয় গোপন পাপের স্বরূপ হ’ল–

ক. ডিজিটাল পাপাচার : পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল চলচ্চিত্র দেখা, সোশ্যাল মিডিয়ায় বেগানার সাথে অনৈতিক কথোপকথন (চ্যাটিং) বা প্রেমালাপে মত্ত হওয়া, কুরুচিপূর্ণ ছবি বা ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা।

খ. দৈহিক ও চারিত্রিক স্খলন : নির্জনে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত, হস্তমৈথুন, অবৈধ প্রেম বা পরকীয়া, রাস্তা-ঘাটে বা মার্কেটে বেগানার প্রতি গোপন দৃষ্টিপাত, যেনা-ব্যভিচার।

গ. ইবাদতে অবহেলা ও রিয়া : মানুষের সামনে দীর্ঘ ও সুন্দর করে ছালাত আদায় করা, কিন্তু নির্জনে অলসতা করা বা একাগ্রতাহীন ইবাদত করা। কোন নেক আমল কেবল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করাও এক প্রকার সূক্ষ্ম ও ভয়াবহ গোপন পাপ।

ঘ. অন্তরের ব্যাধি : হৃদয়ে অন্যের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার পোষণ করা এবং মানুষের সম্পর্কে মনে মনে মন্দ ধারণা রাখা, প্রকাশ্যে পরহেযগারিতা প্রকাশ করে নির্জনে সেটা ধরে না রাখা ইত্যাদি। মূলত গোপন পাপ হ’ল সেই নীরব ঘাতক যা একজন মানুষের দীর্ঘদিনের অর্জিত সম্মান, আমল এবং মানসিক প্রশান্তিকে নিমিষেই ধূলিসাৎ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

গোপন পাপের পরিণাম ও ভয়াবহতা

১. নেক আমল বিনষ্ট হয় :

একজন মুমিনের সারা জীবনের পুঁজি হ’ল তার নেক আমল। হাশরের ময়দানে যখন সূর্যের প্রখরতায় মগজ টগবগ করে ফুটবে, তখন এই আমলগুলোই হবে আমাদের ছায়া, আমাদের বাঁচার অবলম্বন। কিন্তু ক্বিয়ামতের ময়দানে গোপন পাপ সর্বগ্রাসী আগুন হয়ে আমাদের সারাজীবনের নেক আমলের সঞ্চয়কে নিমিষেই ভস্মীভূত করে দিবে। ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছা.) বলেন, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا ‘আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। ছাওবান (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে বলুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বললেন, ‘তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে’।[1]

আল্লাহুল মুস্তা‘আন! তারা কিন্তু কাফের বা মুনাফিক না। তারা তাহাজ্জুদের মতো মর্যাদামণ্ডিত ইবাদতে অভ্যস্ত এবং রাত্রিকালীন কুরআন তেলাওয়াতকারী। আর এটা সবাই স্বীকার করবে যে, অন্তত তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তিরা কখনো বেনামাযী হয় না। বরং তারা সমাজের অন্যান্য বান্দার চেয়ে একটু হ’লেও উঁচু স্তরের বান্দা হিসাবে পরিগণিত। অথচ তাদের আমলনামার পাহাড় ক্বিয়ামতের দিন ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কারণ একটাই, তারা নির্জনে আল্লাহকে ভয় করত না; বরং গোপনে পাপ করে ফেলত। একটু ভাবুন তো! জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা আল্লাহ্র ইবাদতে কত কষ্ট করছি। কত দীর্ঘ ক্বিয়ামুল লায়ল, কত তৃষ্ণার্ত দুপুর কাটানো ছিয়াম, আর কত দান-ছাদাক্বাহ দিয়ে আমরা আমাদের নেক আমলের পাল্লা ভারী করার চেষ্টা করি।

---

[1] ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫; ছহীহাহ হা/৫০৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৫০২৮।

সূচীপত্র

আমারা আকাঙ্ক্ষা করি এই আমলগুলোই হবে জান্নাতের চাবিকাঠি। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছি, এমন কিছু ‘গোপন ছিদ্র’ আমাদের আমলের পাত্রে থাকতে পারে, যা আমাদের অজান্তেই সবটুকু নেক আমল নিঃশেষ করে দিচ্ছে? হ্যাঁ, সেই নীরব ধ্বংসকারীর নামই হ’ল ‘গোপন পাপ’।

আমরা যখন লোকজনের সামনে থাকি, তখন আল্লাহ্র যিকির ও তাসবীহ-তাহলীলে আমাদের জিহ্বা সচল থাকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের প্রোফাইলে দ্বীনদারিতার ছাপ ফুটে ওঠে। আমাদের কথাবার্তা, পোশাক-আশাক ও আচরণে আল্লাহভীতির নিদর্শন দেখা যায়। কিন্তু আমরা যখন নির্জনে থাকি, ঘরের দরজাটি আটকে দেই, জানালার পর্দাটা টেনে দেই, তখন আমাদের সেই আল্লাহভীতি কি থাকে? তখন কি আমরা ভুলে যাই যে, এই অন্ধকার ঘরেও আল্লাহ আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন? যে স্মার্টফোন ও ল্যাপটপ দিয়ে আমরা দাওয়াতী কাজ করি, দ্বীনি আলোচনা শুনি– সেই একই ডিভাইসের সার্চ বক্সে যখন নির্জনে আমরা কোন অশ্লীল নীল ছবির সন্ধান করি, তখন আমরা মূলত মানুষের চেয়ে আল্লাহকে ছোট মনে করছি। এই অসম্মানই আমাদের আমল ধ্বংসের মূল কারণ।

কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ইব্রাহীম বিন হাসান আল-হাযরীতী বলেন, ‘কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে, যখন সে একা থাকে এবং নিজের মোবাইল, কম্পিউটার বা এমন কোন টিভি চ্যানেলের সামনে বসে, যেখানে আল্লাহ হারাম করেছেন এমন বিষয় দেখানো হয়, তখনই সে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে ফেলে’।[২] ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, الْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنَ الذُّنُوبِ، خُصُوصًا ذُنُوبَ الْخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الْمُبَارَزَةَ لِلَّهِ تَعَالَى تُسْقِطُ الْعَبْدَ مِنْ عَيْنِهِ ‘গুনাহ থেকে অত্যন্ত সাবধান থাক, বিশেষ করে নির্জনের গুনাহ থেকে। কারণ আল্লাহ্র অবাধ্যতায় দুঃসাহস দেখানো বান্দাকে তাঁর দৃষ্টি থেকে নামিয়ে দেয় (মর্যাদাহীন করে দেয়)। তুমি নির্জনে তোমার ও আল্লাহ্র মাঝের সম্পর্ক সংশোধন করে নাও, তিনি তোমার প্রকাশ্য অবস্থাকে সংশোধন করে দেবেন’।[৩] আল্লামা ইবনু হাজার হাইতামী (রহ.) বলেন, إِظْهَارُ زِيِّ الصَّالِحِينَ فِي الْمَلَأِ وَانْتِهَاكُ الْمَحَارِمِ وَلَوْ صَغَائِرَ فِي الْخَلْوَةِ ‘জনসমক্ষে নেককারদের বেশভূষা ও আমল প্রকাশ করা, অথচ নির্জনে গেলেই আল্লাহ্র নিষিদ্ধ হারামে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়, যদিও সেটা ছাগীরা গুনাহ হয়’।[৪]

ভদ্র সমাজে অতি পরিচিত আরেকটি গোপন পাপ হ’ল হিংসা। এটি অত্যন্ত জঘন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শায়খ ইবনে উছায়মীন (রহ.)-এর মতে, অন্যের ওপর আল্লাহ্র নে‘মত দেখে অন্তরে কষ্ট পাওয়া বা তা অপসন্দ করাই হ’ল হিংসা। যখন কোন ব্যক্তি মানুষের সামনে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও শুভকামনা প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে তাদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, তখন সে মূলত অন্তরের গোপন পাপে লিপ্ত হয়।[৫]

২. খারাপ মৃত্যু :

মানুষের জীবনের চূড়ান্ত সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে তার শেষ পরিণতির ওপর। জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কৃত ইবাদতগুলো তখনই সার্থক হয়, যখন মৃত্যুটি ঈমানের সাথে ঘটে। কিন্তু গোপন পাপ অনেক সময় এই শেষ মুহূর্তের চিরস্থায়ী কামিয়াবির পথে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে অবলীলায় আল্লাহ্র সীমা লঙ্ঘন করে, তাদের জন্য অন্তিম মুহূর্তটি অত্যন্ত ভয়াবহ হ’তে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ‘তারা লোকদের থেকে লুকাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ থেকে লুকাতে পারে না। তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন’ *(নিসা ৪/১০৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ‘নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাতবাসীদের মত আমল করে, অথচ সে জাহান্নামী। আবার কোন ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে জাহান্নামীদের মত আমল করে, অথচ সে জান্নাতী’।[৬] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু রজব আল-হাম্বলী (রহ.) বলেন, ‘নিশ্চয়ই মন্দ পরিণতি বা অশুভ মৃত্যু হয়ে থাকে বান্দার কোন অভ্যন্তরীণ গোপন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে, যা মানুষ জানতে পারে না; সেটি হ’তে পারে কোন মন্দ কাজ বা অনুরূপ কিছুর কারণে। সুতরাং সেই গোপন স্বভাবটিই মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়’।[৭]

শায়খ উছায়মীন (রহ.) বলেন, ‘সে মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাতবাসীদের মতো আমল করে ঠিকই, কিন্তু যা মানুষের কাছে গোপন থাকে তা হ’ল তার অন্তরের এক মন্দ গোপন রহস্য, যা তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এজন্যই আমি সর্বদা মানুষকে তাদের অন্তর পরিষ্কার করার এবং অন্তরের প্রতি নজর রাখার তাগিদ দেই। কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হ’ল গাছের গোড়ায় দেওয়া পানির মতো, কিন্তু মূল হ’ল গাছের শিকড় অর্থাৎ অন্তর। অনেক মানুষই বাহ্যিক আমলে

---

[২] ইবরাহীম বিন হাসান আল-হাযরীতী, আছারু আমালিল কলব আলা ইবাদাতিছ ছাওম (সঊদী আরব : দারুল ইলম, ১৪৪২হি./২০২১খ্রি.), পৃ. ১০৮।

[৩] ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাতের (দামেশক্ব : দারুল কলম, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৫হি./২০০৪খ্রি.), পৃ. ২০৭।

[৪] ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭হি./১৯৮৭খৃ.), ২/২০৯।

[৫] ইবনে উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব, ২৪/২।

[৬] বুখারী হা/২৮৯৮; মুসলিম হা/১১২; মিশকাত হা/৮৩।

[৭] ইবনু রজব হাম্বালী, জামে‘উল উলূম ওয়াল হিকাম, তাহক্বীক : শু‘আইব আরনাউত্ব (বৈরূত : মু‘আস্সাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করণ, ১৪২২হি./২০০১খৃ.) ১/১৭২।

ভুল না করার ব্যাপারে খুব যত্নশীল, অথচ তার অন্তর মুসলিমদের প্রতি, ওলামাদের প্রতি এবং ভালো মানুষদের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এমন ব্যক্তির পরিণতি মন্দ হওয়ার ভয় থাকে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। কারণ অন্তরে যদি কোন মন্দ গোপন অভিসন্ধি থাকে, তবে তা তার মালিককে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।[৮]

সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) এক রাতে খুব কান্নাকটি করছিলেন। সকাল হ’লে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ’ল- আপনি কি আপনার পাপের ভয়ে এভাবে কাঁদছিলেন? তখন তিনি মাটি থেকে একটি খড়কুটো হাতে নিয়ে বললেন, الذُّنُوبُ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا، وَإِنَّمَا أَبْكِي مِنْ خَوْفِ سُوءِ الْخَاتِمَةِ ‘গুনাহ তো এর চেয়েও তুচ্ছ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ক্ষমার তুলনায় গুনাহ তো এই খড়কুটোর মতোই নগণ্য), আমি তো কাঁদছি মন্দ মৃত্যুর ভয়ে’। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, মুমিন ব্যক্তির এই ভয় থাকা উচিত যে, তার কৃত পাপগুলো মৃত্যুর সময় তাকে অপদস্থ ও নিঃস্ব করবে এবং তার ও উত্তম মৃত্যুর মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়াবে’।[৯] সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)-এর এই কথাটির অর্থ এই নয় যে, তিনি গুনাহকে ছোট মনে করতেন; বরং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, তওবার মাধ্যমে গুনাহ মাফ করা আল্লাহ্‌র জন্য খুব সহজ। কিন্তু আসল ভয় হ’ল- পাপের কারণে অন্তরে যে কালো দাগ পড়ে, তা যেন মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তে ঈমানের ওপর অটল থাকতে বাধা না দেয়। কারণ, মানুষের সারাজীবনের অভ্যাসগুলোই মৃত্যুর সময় তার সামনে ফুটে ওঠে।

অতএব গোপন পাপে অভ্যস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আশঙ্কা থাকে যে, মৃত্যুর সময় সেই পাপই তার ওপর প্রবল হয়ে উঠবে এবং তওবা করার আগেই শয়তান তাকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নির্জনেও আল্লাহকে ভয় করে এবং অন্তর পরিষ্কার রাখে, আল্লাহ তার শেষ পরিণতি অবশ্যই সুন্দর করবেন। সুতরাং নিজের প্রকাশ্য ও গোপন উভয় জগতকে আল্লাহ্‌র অনুগত রাখাই প্রকৃত মুমিনের পরিচয়।

৩. অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় :

গোপন পাপের অন্যতম ভয়ংকর পরিণতি হ’ল অন্তরের সংবেদনশীলতা হারিয়ে যাওয়া। মানুষের প্রতিটি অঙ্গের যেমন সুস্থতা ও অসুস্থতা রয়েছে। ঠিক তেমনি অন্তরের সুস্থতা হ’ল সত্যকে গ্রহণ করার এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করার সক্ষমতা। কিন্তু নির্জনে ক্রমাগত পাপাচার এই সক্ষমতাকে চিরতরে নস্যাৎ করে দেয়। এটি এমন এক পর্যায়, যেখানে মানুষের অন্তর পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্‌র রহমতের আলো সেখানে আর প্রবেশ করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ، ‘মানুষের হৃদয়ে ফিতনাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করে, যেমন আঁশ একটির পর আরেকটি বিছানো হয়ে থাকে এবং যে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তাকে জায়গা দেয় না, তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। ফলে মানুষের অন্তর সমূহ পৃথক পৃথক দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার অন্তর হয় মর্মর পাথরের মতো শ্বেত, যাকে আসমান ও যমীন বহাল থাকা পর্যন্ত (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) কোন ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হয় কয়লার মতো কালো। যেমন উপুড় হওয়া পাত্রের মতো, যাতে কিছুই ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। তা ভালোকে ভালো জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না। ফলে শুধুমাত্র তাই গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা হয়’।[১০]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} ‘বান্দা যখন একটি গোনাহ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর যখন সে গোনাহের কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তা‘আলা যার বর্ণনা করেছেন, ‘কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে’ *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/১৪)*।[১১] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, أَنَّ الذُّنُوبَ إِذَا تَكَاثَرَتْ طُبِعَ عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهَا، فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ ‘নিশ্চয়ই পাপ যখন ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তখন সেই পাপ সম্পাদনকারীর অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়; ফলে সে চরম উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়’।[১২] গোপন পাপ মূলত বিষক্রিয়ার মতো ধীরে ধীরে হৃদয়কে অকেজো করে দেয়। বাহ্যিক ইবাদতের শরীর ঠিক থাকলেও ভেতরে আত্মিক স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। উপুড় করা পাত্রে যেমন বৃষ্টির পানি পড়েও তাতে স্থির হয় না, অন্তরে মোহর লেগে যাওয়া

---

[৮] *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল, ৫/২৩৮।*

[৯] *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী (মরক্কো : দারুল মা‘রেফাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৮হি./১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ১৬৭।*

[১০] *মুসলিম হা/১৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৩১৯; আহমাদ হা/২৩৩২৮; ছহীহুল জামে‘ হা/২৯৬০।*

[১১] *তিরমিযী হা/৩৩৩৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬২০, সনদ হাসান।*

[১২] *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জওয়াবুল কাফী, পৃ. ৬০।*

ব্যক্তির ক্ষেত্রেও দ্বীনের জ্ঞান বা নছীহত কোন কাজে আসে না। সুতরাং অন্তরের এই চিরস্থায়ী পঙ্গুত্ব ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু থেকে বাঁচতে হ’লে নির্জনের পাপাচার বর্জন করে অন্তরের আয়নাকে সর্বদা তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে উজ্জ্বল রাখা অপরিহার্য।

৪. তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত :

গুনাহের কারণে মানুষ যেসব অদৃশ্য ও গোপন শাস্তির সম্মুখীন হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শাস্তি হ’ল নেক কাজের তাওফীক্ব হারিয়ে ফেলা। অনেক সময় আমরা বুঝতেও পারি না যে, নির্জনে করা একটি পাপাচার কিভাবে আমাদের পুরো জীবনকে বরকতহীন করে দিচ্ছে। গোপন পাপের ফলে মানুষের বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাধারায় বিকৃতি ঘটে, সত্য-মিথ্যা চেনার ক্ষমতা লোপ পায় এবং সময়ের ভয়াবহ অপচয় ঘটে। সবচেয়ে খারাপ পরিণতি হল, এর ফলে বান্দা মহান রবের সাথে নিভৃত মুনাজাত ও ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ‘অতঃপর তোমাদের কি হ’ল যে, তোমরা মুনাফিকদের বিষয়ে দু’দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন তাদের কৃতকর্মের জন্য। তাহ’লে কি তোমরা পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কোন (মুক্তির) পথ পাবে না’ *(নিসা ৪/৮৮)*।

অত্র আয়াতের وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا (আল্লাহ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন তাদের কৃতকর্মের জন্য)-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, এর অর্থ হ’ল- তাদের পাপের কারণে, বিশেষ করে তাদের সংকল্প বা মন্দ নিয়তের কারণে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সেই (বিপথগামী) অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন যে অবস্থায় তারা ছিল। বস্তুত পাপ বান্দাকে নেক আমল করার তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত করে। আর পাপসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হ’ল গোপন পাপ। সেটা হ’তে পারে অন্তরের মন্দ নিয়তের মাধ্যমে, অথবা লোকসমক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করে নির্জনে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে’।[১৩]

অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ ছালাত আদায় করতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না, কুরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা থাকলেও পারছে না কিংবা দ্বীনি কোন মজলিসে বসার সুযোগ পাচ্ছে না। তিনি হয়তো মনে করছেন এটি তার সময়ের অভাব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি তার ‘গোপন পাপের’ এক অদৃশ্য শিকল যা তাকে কল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বিশেষত কেউ যখন ইচ্ছাকৃতভাবে নির্জনতার সুযোগে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়, তখন আল্লাহ তার নেক আমলের আগ্রহ কেড়ে নেন। তাই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ্র বিশেষ তাওফীক্ব ও সহযোগিতা প্রার্থনা করতে হ’লে নির্জনতার এই বিষাক্ত ছোবল থেকে আত্মরক্ষা করা অপরিহার্য।

৫. ভুলে যাওয়ার প্রবণতা ও ইলমের নূর থেকে বঞ্চিত হওয়া :

গোপন পাপের একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব হ’ল মানুষের মেধা ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়া এবং অর্জিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। দ্বীনি জ্ঞান হ’ল বিশেষ এক ধরণের নূর বা আলো, যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দার হৃদয়ে ঢেলে দেন। কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তি নির্জনে পাপাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, তখন সেই আলো নিভে যায় এবং হৃদয় এক দীর্ঘস্থায়ী বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, الْمَعَاصِي تُنْسِي اللَّهَ وَمِنْ عُقُوبَاتِهَا: أَنَّهَا تَسْتَدْعِي نِسْيَانَ اللَّهِ لِعَبْدِهِ، وَتَرْكَهُ وَتَخْلِيَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ وَشَيْطَانِهِ، وَهُنَالِكَ الْهَلَاكُ الَّذِي لَا يُرْجَى مَعَهُ نَجَاةٌ ‘পাপাচার আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয়। আর গুনাহের অন্যতম শাস্তি হ’ল- এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাকে ভুলিয়ে রাখার (উপেক্ষা করার) কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ তাকে তার নিজের প্রবৃত্তি ও শয়তানের কবলে একাকী ছেড়ে দেন। আর এখানে নিহিত রয়েছে এমন চরম ধ্বংস, যেখান থেকে আর মুক্তির কোন আশা থাকে না’।

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে? আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরাই হ’ল অবাধ্য’ *(হাশর ৫৯/১৮-১৯)*।[১৪]

ইমাম শাফেঈ (রহ.) যখন সর্বপ্রথম ইমাম মালেকের কাছে ইলম হাছিলের জন্য আসেন, তখন ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং অসাধারণ বোধশক্তি দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি নসিহত করে বললেন, إِنِّي أَرَى اللَّهَ قَدْ أَلْقَى عَلَى قَلْبِكَ نُورًا، فَلَا تُطْفِئْهُ بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ، ‘আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ তোমার হৃদয়ে ইলমের নূর ঢেলে দিয়েছেন। অতএব পাপের অন্ধকারের মাধ্যমে এই নূরকে নিভিয়ে দিও না’।[১৫] ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর সেই বিখ্যাত কবিতাটি এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

---

[১৩] আব্দুল আযীয আত-ত্বারীফী, আত-তাফসীর ওয়াল বায়ান লি আহকামিল কুরআন, ২/৯২৯।

[১৪] ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ৭০।

[১৫] ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১১হি./১৯৯১খ্রি.), ৪/১৯৯; আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ৫২।

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوءَ حِفْظِي * فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
وَقَالَ اعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ * وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَاه عَاصِي

‘আমি (আমার ওস্তায) ওকী‘-র কাছে দুর্বল মুখস্ত শক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। ফলে তিনি আমাকে পাপ বর্জনের পরামর্শ দিলেন। আর বললেন, জেনে রেখ! ইলম হ’ল নূর। আর কোন পাপিষ্ঠকে আল্লাহ্‌র নূর প্রাদান করা হয় না’।[১৬]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, وَلِلْمَعَاصِي مِنَ الْآثَارِ الْقَبِيحَةِ الْمَذْمُومَةِ، الْمُضِرَّةِ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، فَمِنْهَا: حِرْمَانُ الْعِلْمِ، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ، وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِئُ ذَلِكَ النُّورَ، ‘গুনাহ ও নাফরমানীর এমন অনেক কুৎসিত, নিন্দনীয় এবং ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে যা দুনিয়া ও আখেরাতে হৃদয় ও শরীরের ওপর নিপতিত হয়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তার মধ্যে অন্যতম হ’ল ইলম বা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হওয়া। নিশ্চয়ই ইলম হ’ল এক বিশেষ নূর, যা আল্লাহ বান্দার হৃদয়ে ঢেলে দেন। আর গুনাহ সেই নূরকে নিভিয়ে দেয়’।[১৭]

বর্তমান যুগে অনেক শিক্ষার্থী বা পাঠক অভিযোগ করেন যে, অনেক পড়েও তারা মনে রাখতে পারছেন না। ইবাদতের ছোট ছোট বিষয়গুলোও ভুলে যাচ্ছেন। যখন যে দো‘আ পড়তে হয়, সেটা পড়তে ভুলে যাচ্ছেন। অনেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাতে দীর্ঘ সময় ধরে পড়াশোনা করে, কিন্তু পরদিন পরীক্ষার হলে গিয়ে পরিচিত প্রশ্নগুলোর উত্তর মনে করতে পারে না। আবার কেউ ছালাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার পর থেকে সালাম ফেরা পর্যন্ত কোন দো‘আই মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারেন না, কিংবা রুকু-সিজদার দো‘আ গুলিয়ে ফেলেন। এই বাস্তবতার পেছনে একটি সূক্ষ্ম ও গভীর কারণ অনেক সময় উপেক্ষিত থেকে যায়, আর সেটা হ’ল গোপন পাপাচার। নির্জনে স্মার্টফোন বা ইন্টারনেটে কৃত পাপাচারগুলো মানুষের বিবেককে আঘাত করে। সেই সময় হয়তো তা তুচ্ছ মনে হয়, কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তার মন ও মস্তিষ্কে এর প্রভাব পড়ে।

তবে এখানে এটাও মনে রাখা যরূরী যে, সব ভুলে যাওয়া বা মনোযোগের সমস্যা শুধু পাপের কারণে নয়। অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম, ঘুমের অভাব, মানসিক চাপ, অগোছালো পড়ার পদ্ধতি– এসবও বড় ভূমিকা রাখে। কিন্তু গোপন পাপ এই সমস্যাগুলোকে আরও তীব্র করে তোলে এবং আত্মিক দিক থেকেও ক্ষতির পরিমাণ বাড়ায়। সুতরাং একজন শিক্ষার্থী বা সাধারণ কোন ব্যক্তি যদি দেখে যে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হচ্ছে বা ইবাদতে মনোযোগ কমে যাচ্ছে, তাহ’লে শুধু পড়ার পদ্ধতি ও বয়স বাড়ার কারণে নয়; বরং নিজের গোপন জীবন, একাকী সময়ের ব্যবহার এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এই আত্মসমালোচনাই হ’তে পারে তার উন্নতির সোপান।

৬. অন্তর কঠোর হয়ে যায় :

পার্থিব জীবনে মানুষ সাধারণত ধন-সম্পদের অভাব বা শারীরিক অসুস্থতাকেই বড় বিপদ মনে করে। কিন্তু সালাফে ছালেহীন তথা পূর্বসূরি নেককারগণের নিকট সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল অন্তরের কঠোরতা। গোপন পাপাচার মানুষের হৃদয়কে শক্ত ও পাথর সদৃশ করে দেয়, ফলে সেখান থেকে কোমলতা এবং আল্লাহভীতি বিদায় নেয়। প্রখ্যাত তাবেঈ মালেক বিন দীনার (রহ.) বলেন, إِنَّ لِلَّهِ عُقُوبَاتٍ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ؛ ضَنْكٌ فِي الْمَعِيشَةِ، وَوَهْنٌ فِي الْعِبَادَةِ، وَمَا ضُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ ‘নিশ্চয়ই অন্তর ও দেহের ওপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিছু শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে; যেমন জীবনযাপনে সংকীর্ণতা এবং ইবাদতে অলসতা বা দুর্বলতা। আর কোন বান্দাকেই ‘অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়া’র চেয়ে বড় কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি’।[১৮]

যখন মানুষের অন্তর কঠোর হয়ে যায়, তখন সে উপদেশ গ্রহণ ও শিক্ষা লাভের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার সামনে পবিত্র কুরআনের ভীতিপ্রদ আয়াত পাঠ করা হ’লেও সে প্রভাবিত হয় না; এমনকি চোখের সামনে কারো মৃত্যু বা কোন বড় দুর্ঘটনা দেখলেও তার হৃদয়ে আখেরাতের চিন্তা উদয় হয় না। নির্জনে কৃত গুনাহের কারণেই মানুষ এই আধ্যাত্মিক পঙ্গুত্বের শিকার হন। আল্লাহ বলেন, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ‘যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হ’ল না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাজগুলিকে তাদের নিকটে শোভনীয় করে দেখালো’ *(আন‘আম ৬/৪৩)*। অত্র আয়াতে তাফসীরে ইমাম তাবারী বলেন, তাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ হ’ল তারা এমন সব কাজ করত, যা আল্লাহ অপসন্দ করেন এবং যার কারণে তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন’।[১৯]

শিক্ষা গ্রহণ বা উপদেশ গ্রহণ মূলত তাক্বওয়ার নূরের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। কিন্তু অন্তর যখন কঠোর হয়ে যায়, তখন সেই নূর অন্তর থেকে বিদায় নেয়। আল্লাহ বলেন, سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ‘সত্বর উপদেশ গ্রহণ করবে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি ভয় করে’ *(আ‘লা ৮৭/১০)*। অর্থাৎ যারা নির্জনে ও লোকচক্ষুর অনন্তরালে আল্লাহকে ভয় করে, কেবল তাদের অন্তরই

---

[১৬] ক্বাসত্বালানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুননিইয়াহ (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফীক্বিইয়াহ, তা.বি), ৩/১০; আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ৫২।

[১৭] ইবনু ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ৫২।

[১৮] আবু নু‘আইম আল-ইছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬/২৮৭।

[১৯] ইমাম ত্বাবারী, জামে‘উল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন (তাফসীরে তাবারী), ১১/৩৫৭।

সূচীপত্র

উপদেশ গ্রহণের জন্য উর্বর থাকে। পক্ষান্তরে যারা নির্জনে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় দুঃসাহস দেখায়, তাদের অন্তর ক্রমশ সংবেদনহীন হয়ে পড়ে। তাই হৃদয়ের কোমলতা রক্ষা করতে এবং হেদায়াতের নূরে নিজেকে উদ্ভাসিত রাখতে নির্জনতার প্রতিটি মুহূর্তকে পাপাচারমুক্ত রাখা অপরিহার্য।

৭. মনস্তাত্ত্বিক অশান্তি ও গোপন প্রভাব :

পাপের এক ধরণের অদৃশ্য বা গোপন শাস্তি হ’ল গুনাহের পর্দাগুলো অবাধ্য ব্যক্তির অন্তরে এক ভয়াবহ একাকীত্ব ও বিষণ্ণতা তৈরী করে। পাপীর এই একাকিত্ববোধ তার রবের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে এবং অন্য মানুষের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রেও অনুভব করে। মূলত গুনাহের এই আবরণ গুলো অনেকটা চুম্বকের মত, যা মানুষের অন্তরে হরেক রকমের ভয়-ভীতি টেনে আনে। যেমনটি মহান আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ‘এরা হ’ল শয়তান! যারা তাদের বন্ধুদের থেকে তোমাদের ভয় দেখায়’ *(আলে ইমরান ৩/১৭৫)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান আস-সা’দী (রহ.) বলেন, ‘শয়তান তার বন্ধুদের মাধ্যমে সেই সব লোকদের ভয় দেখায়, যাদের ঈমান নেই অথবা (গুনাহের কারণে) যাদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে’।[২০]

পাপী ব্যক্তির ভয়ের কোন শেষ নেই, কখনো অসুস্থতার ভয়, কখনো রিযিকের দুশ্চিন্তা, কখনো শত্রুর ভয়, আবার কখনো ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা। এমনকি কখনো কখনো এমন এক অজানা ভয় তাকে গ্রাস করে, যার কারণ সে নিজেও জানে না। আবার কেউ হয়ত আগে খুব স্বাভাবিকভাবে মানুষের সাথে মিশত, আত্মবিশ্বাসী ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে কিছু গোপন পাপে জড়িয়ে পড়ার পর সে নিজেই লক্ষ্য করবে যে, মানুষের সামনে গেলে অকারণে অস্বস্তি কাজ করছে, চোখে চোখ রাখতে সংকোচ হচ্ছে, মনে হয় সবাই যেন তাকে বিচার করছে। যদিও বাস্তবে কেউ কিছু জানে না, তবুও অন্তরের ভেতরে এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়ে যায়। এটা মূলত গোপন পাপের একটি সুক্ষ্ম প্রভাব।

তাছাড়া পাপের আরো কিছু গোপন প্রভাব আছে, যা অধিকাংশ সময় বান্দা বুঝতে পারে না। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, ‘পাপ কখনোই শাস্তি বা কুপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকে না। কিন্তু বান্দা তার অজ্ঞতার কারণে সেই শাস্তির অনুভূতি টের পায় না; কারণ সে তখন এমন এক নেশাগ্রস্ত, অবশ বা ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো থাকে যে ব্যথার অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। পাপাচারের পরিণাম হিসাবে শাস্তি আসাটা ঠিক তেমনি অবধারিত, যেমন আগুনে হাত দিলে পুড়ে যাওয়া, আছাড় খেলে ভেঙে যাওয়া, পানিতে পড়লে ডুবে যাওয়া কিংবা বিষপানে দেহ নষ্ট হয়ে যাওয়া অবধারিত। কখনো পাপাচারের ক্ষতি সাথে সাথেই দেখা দেয়, আবার কখনো তা প্রকাশ পেতে কিছুটা দেরি হয়। যেমন রোগের উপসর্গ সাথে সাথে প্রকাশ পায় আবার কিছুটা সময়ও নিতে পারে। এই জায়গাতেই বান্দার বড় ভুল হয়ে যায়। সে পাপ করে কিন্তু সাথে সাথে তার কোন কুফল দেখতে পায় না। সে জানে না যে, বিষ বা ক্ষতিকর বস্তু যেমন তিলে তিলে নিজের কাজ করে যায়, পাপও ঠিক সেভাবেই ধীরে ধীরে কাজ করে। বান্দা যদি তওবা ও আত্মশুদ্ধিরূপ ওষুধের মাধ্যমে নিজেকে সামলে না নেয়, তবে সে ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যায়। একটিমাত্র পাপের পরিণাম যদি এমন হয় যার কোন প্রতিষেধক নেওয়া হয়নি, তবে প্রতিদিন ও প্রতি ঘণ্টায় স্তূপ হওয়া পাহাড় সমান পাপের অবস্থা কেমন হবে?’[২১]

ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, فَوَا أَسَفَا لِمَضْرُوب بِالسِّيَاطِ مَا يُحِسُّ بِالْأَلَمِ! وَلِمُثْخَنٍ بِالْجِرَاحِ، وَمَا عِنْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ خَبَرٌ! وَلِمُتَقَلِّبٍ فِي عُقُوبَاتٍ مَا يَدْرِي بِهَا! وَلَعَمْرِي إِنَّ أَعْظَمَ الْعُقُوبَةِ أَنْ لَا يَدْرِيَ بِالْعُقُوبَةِ، ‘আফসোস সেই ব্যক্তির জন্য যাকে চাবুক মারা হচ্ছে অথচ সে ব্যথা অনুভব করছে না! আক্ষেপ সেই ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তির জন্য যার নিজের অবস্থা সম্পর্কে কোন খবর নেই! পরিতাপ সেই ব্যক্তির জন্য যে শাস্তির আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে অথচ সে তা টেরও পাচ্ছে না! আমার জীবনের কসম! নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় শাস্তি হ’ল নিজের শাস্তি সম্পর্কে কোন অনুভূতি বা জ্ঞান না থাকা’।[২২]

৮. ইবাদতের মিষ্টতা হারিয়ে যায় :

গোপন পাপের অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিণাম হ’ল ইবাদতের স্বাদ বা মিষ্টতা হারিয়ে ফেলা। মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের মাঝে যে অনাবিল প্রশান্তি নিহিত রয়েছে, পাপাচারের কলুষতা সেই স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। মূলত ইবাদত তখন কেবল যান্ত্রিক একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যা হৃদয়ে কোন আবেদন তৈরি করতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহ.) বলেন, উহাইব ইবনুল ওয়ারদ (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে, সে কি ইবাদতের স্বাদ পায়? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, وَلَا مَنْ يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ ‘না, এমনকি সেই ব্যক্তিও পায় না যে গুনাহ করার সংকল্প করে’।[২৩] বিশর ইবনুল হারেছ (রহ.) বলেন, لَا يَجِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهَوَاتِ حَائِطًا مِنْ حَدِيدٍ ‘বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে নিজের এবং কুপ্রবৃত্তির কামনার মাঝে লোহার একটি প্রাচীর গড়ে তুলবে’।[২৪]

---

[২০] *তাফসীরে সা’দী, পৃ. ১৫৭।*

[২১] *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জওয়াবুল কাফী, পৃ. ১১৬।*

[২২] *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ২০৩।*

[২৩] *শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, তাহক্বীক্ব : শু‘আইব আরনাঊত্ব ও অন্যান্য (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.), ৭/১৯৯; হাফেয মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাঈর রিজাল, ৩১/১৭১।*

[২৪] *আবু নু‘আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৫৪।*

ইয়াহইয়া বিন মু‘আয (রহ.) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ عَلَى قَدْرِ إِدَامَتِهِ لِطَاعَتِهِ يُحَلِّيهَا فِي صَدْرِهِ وَعَلَى قَدْرِ لَهْجَتِهِ بِذِكْرِهِ يُدِيمُ أَلْطَافَ بِرِّهِ ‘বান্দা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে যতটুকু অবিচল থাকে, আল্লাহ সেই আনুগত্যকে তার হৃদয়ে ততটুকুই মধুর করে দেন। তার জিহ্বা আল্লাহ্‌র স্মরণে যতটুকু সিক্ত থাকে, আল্লাহ তার ওপর তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ততটুকুই নিরবচ্ছিন্ন রাখেন’।[২৫]

ইবনু রজব হাম্বলী (রহ.) বলেন, إِنَّ الذُّنُوبَ تَتْبَعُهَا وَلَابُدَّ مِنَ الْهُمُومِ وَالْآلَامِ وَضِيقِ الصَّدْرِ وَالنَّكَدِ، وَظُلْمَةِ الْقَلْبِ، وَقَسْوَتِهِ أَضْعَافُ أَضْعَافُ مَا فِيهَا مِنَ اللَّذَّةِ، وَيَفُوتُ بِهَا مِنْ حَلَاوَةِ الطَّاعَاتِ ‘নিশ্চয়ই পাপের পেছনে আবশ্যিকভাবেই দুশ্চিন্তা, বেদনা, মনের সংকীর্ণতা, অশান্তি, অন্তরের অন্ধকার ও কঠোরতা এমনভাবে ধেয়ে আসে যা সেই পাপের ক্ষণিক স্বাদের চেয়ে বহুগুণ বেশী। আর এর ফলে ইবাদতের মিষ্টতা বা স্বাদও হারিয়ে যায়’।[২৬]

৯. মানুষের অন্তরের মহব্বত উঠে যাওয়া ও লাঞ্ছনা :

মানুষের সম্মান ও মর্যাদা কেবল তার পোশাক বা পদমর্যাদার ওপর নির্ভর করে না; বরং এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসা এক বিশেষ দান। গোপন পাপের অন্যতম ভয়াবহ জাগতিক পরিণতি হ’ল মানুষের হৃদয় থেকে সেই অপরাধীর প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি উঠে যাওয়া। বান্দা যখন নির্জনে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার দুঃসাহস দেখায়, তখন আল্লাহ আসমানবাসী ও যমীনবাসীদের অন্তরে তার প্রতি এক ধরনের ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন, যা সে ঘুণাক্ষরেও টের পায় না।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, حَذَرَ امْرُؤٌ أَنْ تُبْغِضَهُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ‘প্রত্যেক ব্যক্তির এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত যেন মুমিনদের অন্তর তাকে ঘৃণা করতে শুরু না করে, অথচ সে টেরও পাবে না’। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ ‘তুমি কি জানো সেটা কী?’ বর্ণনাকারী বললেন, ‘না’। তখন আবুদ্দারদা (রা.) বললেন, الْعَبْدُ يَخْلُو بِمَعَاصِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُلْقِي اللهُ بُغْضَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ‘বান্দা যখন নির্জনে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় (পাপে) লিপ্ত হয়, তখন মহান আল্লাহ মুমিনদের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ঢেলে দেন, যা সে নিজেও বুঝতে পারে না’।[২৭] ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ‘সুতরাং তোমরা তোমাদের নির্জন মুহূর্ত এবং গোপন অবস্থাগুলোকে কখনো অবহেলা করো না। কারণ সব আমলই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রতিদান দেওয়া হয় ইখলাছের পরিমাপ অনুযায়ী’।[২৮]

অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না কেন মানুষ আমাদের এড়িয়ে চলছে বা কেন আমাদের প্রতি তাদের পূর্বের সেই শ্রদ্ধা ও মায়া অবশিষ্ট নেই। বাহ্যিকভাবে হয়তো আমরা খুব অমায়িক ব্যবহার করছি, কিন্তু আমাদের নির্জন মুহূর্তের পাপাচার আমাদের ব্যক্তিত্বের নূর কেড়ে নিচ্ছে। আমরা যদি আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের গোপন সম্পর্কটুকু সংশোধন করি, তবে আল্লাহ মানুষের অন্তরে আমাদের জন্য অকৃত্রিম মর্যাদা তৈরি করে দিবেন। উছমান (রা.) বলেন, مَا أَسَرَّ أَحَدٌ سَرِيرَةً إِلَّا وَأَظْهَرَهَا اللَّهُ عَلَى قَسَمَاتِ وَجْهِهِ أَوْ فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، ‘কোন ব্যক্তি এমন কোন গোপন বিষয় লুকিয়ে রাখে না, যা আল্লাহ তার চেহারার অভিব্যক্তি অথবা জিহ্বার অসতর্ক উচ্চারণে প্রকাশ করে দেন না’।[২৯] অর্থাৎ কেউ যদি নির্জনে কোন পাপে জড়িয়ে পড়ে, তবে তার অন্তরের কলুষতা তার চেহারার ভাঁজে অথবা কথার ফাঁক দিয়ে মানুষের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবেই। তিনি মানুষের সামনে ভালো সাজার অভিনয় করতে পারেন, কিন্তু ভেতরের অন্ধকারকে বেশীক্ষণ চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, وَرَأَيْتُ أَقْوَامًا مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْعِلْمِ، أَهْمَلُوا نَظَرَ الْحَقِّ -عَزَّ وَجَلَّ- إِلَيْهِمْ فِي الْخَلَوَاتِ، فَمَحَا مَحَاسِنَ ذِكْرِهِمْ فِي الْجَلَوَاتِ، فَكَانُوا مَوْجُودِينَ كَالْمَعْدُومِينَ، لَا حَلَاوَةَ لِرُؤْيَتِهِمْ، ولا قَلْبَ يَحِنُّ إِلَى لِقَائِهِمْ، ‘আমি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত এমন অনেক সম্প্রদায়কে দেখেছি, যারা নির্জনে মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টির কথা ভুলে গিয়ে অবহেলায় মত্ত হয়েছে। ফলে আল্লাহ জনসমক্ষে তাদের সুখ্যাতি ও মর্যাদাকে মুছে দিয়েছেন। তারা জীবিত থাকা সত্ত্বেও মৃতদের মতো হয়ে গিয়েছিল; তাদের দর্শনে কোন মাধুর্য ছিল না এবং কারো অন্তর তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হ’ত না’।[৩০] অতএব আমরা যদি চাই মানুষ আমাদের সম্মান করুক এবং ভালোবাসুক, তবে মানুষের সামনে কৃত্রিম অভিনয় করার চেয়ে নিজের নির্জন জগতকে আল্লাহ্‌র কাছে সুন্দর করা অপরিহার্য। কারণ বান্দার ভেতরটা সুন্দর হ’লে আল্লাহ তার চেহারা ও কথাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে দেবেন। পক্ষান্তরে গোপন পাপ হ’ল সেই গ্লানি, যা মানুষের মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে দেয় এবং তাকে জনসমক্ষে লাঞ্ছিত ও একাকী করে ফেলে। তাই আত্মমর্যাদা ও সামাজিক সম্মান রক্ষার প্রধান শর্ত হ’ল আল্লাহ্‌র দৃষ্টিকে ভয় করে নির্জনতাকে পাপাচারমুক্ত রাখা।

১০. আল্লাহ্‌র নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যায় :

মানুষের জীবনে সুখ, শান্তি, রিযিক, মেধা, সুস্থতা, ইবাদতের সুযোগ ও আগ্রহ প্রভৃতি আল্লাহ্‌র বিশেষ নে‘মত। কিন্তু

---

[২৫] হিলয়াতুল আওলিয়া, ১০/৫৮।
[২৬] তাফসীরে ইবনে রজব হাম্বলী, ২/১৩৩।
[২৭] আবু নু‘আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ১/২১৫।
[২৮] ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ১৮৬।
[২৯] ছালেহ আল-মাগামিসী, তাআম্মুলাত কুরআনিয়্যাহ, ২২/৬।
[৩০] ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ১৪৮।

নির্জনে কৃত পাপাচার এই নে'মতগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে এবং এক সময় তা জীবন থেকে চিরতরে ছিনিয়ে নেয়। পাপাচার কেবল পরকালেই ক্ষতি করে না, বরং ইহকালেই বান্দাকে প্রাপ্ত নে'মত থেকে বঞ্চিত করে দেয়। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রা.) বলেন, 'বান্দা যখনই কোন গুনাহ করে, সেই গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কোন না কোন নে'মত বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে যদি তওবা করে এবং আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসে, তবে সেই নে'মত (বা তার সমতুল্য কিছু) তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে যদি পাপে অবিচল থাকে, তবে তা আর ফিরে আসে না। এভাবে গুনাহসমূহ বান্দার কাছ থেকে নে'মতসমূহ ছিনিয়ে নিতে থাকে, এমনকি একপর্যায়ে তার সমস্ত নে'মতই অপসৃত হয়ে যায়। আর সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল ঈমাদ। ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান এবং লুণ্ঠতরাজের মত পাপসমূহ এই ঈমানী নে'মতকে দূর করে দেয় ও ছিনিয়ে নেয়'।[৩১]

নেক আমলের সুযোগ পাওয়া বা ইবাদতে মনোযোগী হ'তে পারাও অনেক বড় নে'মত। ফুযাইল ইবনে ইয়ায (১০৭-১৮৭হি.) বলেন, مَنْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الْهَـــوَى وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ مَوَادُّ التَّوْفِيق، 'কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা যার উপর বিজয়ী হয়। তার থেকে তাওফীকের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়'।[৩২] অর্থাৎ পাপ করার কারণে তার থেকে নেক কাজের সুযোগগুলো কেড়ে নেওয়া হয়। সালাফে ছালেহীনের জীবনে এর অনেক চাক্ষুষ উদাহরণ পাওয়া যায়। সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) বলেন, حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته، 'একটি পাপের কারণে আমি পাঁচ মাস ক্বিয়ামুল লায়ল থেকে বঞ্চিত হয়েছি'। তাকে বলা হ'ল সেটা কী পাপ? তিনি বলেন,رأيت رجلاً يبكي، فقلت في نفسي: هذا مراء، 'আমি এক ব্যক্তিকে কাঁদতে দেখে মনে মনে বলেছিলাম, সে ভান করছে'।[৩৩] সুবহানাল্লাহ! অন্যের ইখলাছ নিয়ে কেবল মনে মনে সন্দেহ করার কারণে যদি তাহাজ্জুদের নে'মত চলে যায়, তবে আজ আমরা নির্জনে যেসব ভয়াবহ পাপাচার করছি, তার ফলে আমাদের জীবন থেকে কত কল্যাণ যে বিদায় নিচ্ছে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর কাছে যখন কোন মাসআলা জটিল বা অস্পষ্ট হয়ে যেত, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলতেন, مَا هَذَا إِلَّا لِذَنْبٍ أَحْدَثْتُهُ 'এটি আমার নতুন কোন পাপের কারণেই ঘটেছে'। তারপর তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন, অনেক সময় উঠে ছালাত আদায় করতেন; অতঃপর মাসআলাটি তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে যেত এবং তিনি বলতেন, رَجَوْتُ أَنِّي تِيبَ عَلَيَّ 'আমি আশা করি আমার তওবা কবুল করা হয়েছে'।[৩৪] সুতরাং সবসময় মনে রাখতে হবে যে, গোপন পাপ মানুষের নে'মত ও সফলতার ভিত্তিগুলোকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। তাই জীবনের প্রতিটি নে'মতকে টিকিয়ে রাখতে এবং ঈমানের নূর বৃদ্ধি করতে নির্জনতার প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও সন্তুষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমে দিয়ে সাজিয়ে তোলা অপরিহার্য।

উপসংহার :

গোপন পাপ বান্দার পাহাড়সম নেক আমলকে নিমিষেই ধূলিসাৎ করে দেয়। এটি মানুষের অন্তরকে কঠোর করে, মেধা ও ইবাদতের স্বাদ কেড়ে নেয় এবং পরিশেষে এক লাঞ্ছনাকর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। যারা নির্জনে আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহ তাদের মর্যাদা মুমিনদের হৃদয় থেকে মুছে দেন। তাই ইহকালীন সম্মান ও পরকালীন মুক্তির জন্য প্রকাশ্য জীবনের চেয়েও গোপন জগতকে অধিক পবিত্র রাখা উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের নির্জনতাকে তাঁরই আনুগত্যের নূরে আলোকিত করুন। আমীন!

---

[৩১] *ইবনুল ক্বাইয়িম, ত্বারীকুল হিজরাতাইন, পৃ. ২৭১।*

[৩২] *সাফ্‌ফারীনী, গিযাউল আলবাব (মিসর : মুআস্‌সাসাহ কুরতুবাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খৃ.), ২/৪৫৮।*

[৩৩] *আব্দুল কাদের জীলানী, গুনয়াতুত ত্বালেবীন (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.), ২/১৫৫; ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন ১/৩৫৬।*

[৩৪] *ইবনুল ক্বাদের আল-কুরাশী, আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ (হায়দারাবাদ : মাজলিসু দাইরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিইয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৩২হি.), ২/৪৮৭।*

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES
ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস
ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২
আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ
সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!
আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :
- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।
বিঃ দ্রঃ
- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**
ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আশূরা উপলক্ষ্যে শী'আদের বিকৃত শোকসংস্কৃতি

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ভূমিকা :

১০ই মুহাররম ইসলামী ক্যালেণ্ডার তথা হিজরী সনের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন ফেরআউনের হাত থেকে মূসা (আ.) নাজাত পেয়েছিলেন, যে দিনটিকে পরবর্তীকালে ইহূদীরা ছিয়ামের মাধ্যমে উদযাপন করত। রাসূল (ছা.) মদীনায় আসার পর মুসলমানদেরকে শুকরিয়া স্বরূপ এই ছিয়াম পালন করার জন্য নির্দেশনা দেন। সেই থেকে উম্মতে মুহাম্মাদী নাজাতে মূসার স্মরণে এই দিনটি এবং এর আগে-পরের আরেকটি দিন ছিয়াম পালন করে আসছে। পরবর্তীতে কাকতালীয়ভাবে ৬১ হিজরীতে একই দিনে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছা.)-এর দৌহিত্র হোসাইন (রা.) ইয়াযীদের বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। এই শাহাদাতের ঘটনা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য এক শোকাবহ ও শিক্ষণীয় ঘটনা। কিন্তু এই শোক ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের নামে কালক্রমে শী'আ সম্প্রদায়ের মধ্যে হাযারো 'অপসংস্কৃতি' বা 'বিদ'আতী' কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে, যা আশূরায়ে মুহাররমের মূল ইতিহাসকে বিকৃত করে ফেলে। এমনকি কালক্রমে ১০ই মুহাররম আশূরার দিন না হয়ে 'কারবালা দিবস' হিসাবে পরিচিত হয়ে যায়। ভারত উপমহাদেশে শী'আদের দৌরাত্মের কারণে তাদের প্রভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের অনুসারীদের মধ্যেও হাযারো বিদ'আতী রসম-রেওয়ায ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত উপমহাদেশের নবাব-আমীরদের পৃষ্ঠপোষকতায় শী'আ মতবাদের চর্চা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু শী'আ সম্প্রদায়ের প্রভাবে পুরান ঢাকার হোসাইনী দালান ও চট্টগ্রামের ইমামবারাকে কেন্দ্র করে আশূরার কুসংস্কারপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আজও টিকে আছে। এই প্রবন্ধে তা'যিয়া মিছিল, বুক চাপড়ানো, শিকল ও তলোয়ার দিয়ে শরীর রক্তাক্তকরণ (তাতবীর) প্রভৃতি শী'আ আচার-অনুষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল, যেন এসকল বিদ'আতী রসম- রেওয়াজ থেকে সচেতন মুসলিম সমাজ আত্মরক্ষা করতে পারে।

বাংলাদেশে শী'আ সম্প্রদায় ও আশূরার প্রেক্ষাপট :

বাংলাদেশে শী'আরা একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ)। মূলত এই সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগই বিহারী, দাউদী বোহরা ও নিজারী ইসমাঈলীদের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে শী'আ সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ও প্রভাব মূলত মোগল আমল থেকে জোরালো হয়। মোগল সম্রাটদের অনেকেই পারস্য (ইরান) সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। বিশেষ করে বাংলার সুবাদার শাহ সুজার শাসনামলে (১৬৩৯-১৬৬০) প্রচুর শী'আ সাধারণ জনগোষ্ঠী, সৈন্য এবং পন্ডিত পারস্য থেকে বাংলায় আসে। ১৬৪২ সালে (মতান্তরে ১৬৭৬) মীর মুরাদ কর্তৃক ঢাকায় হোসাইনী দালান নির্মাণ বাংলাদেশে শী'আদের ধর্মীয় চর্চাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করে। পরবর্তীতে নায়েব-এ-নাযেমদের পৃষ্ঠপোষকতায় আশূরা একটি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে শী'আ সম্প্রদায় প্রধানত দু'টি ধারায় বিভক্ত। (১) ইছনা আশারিয়াহ (اثنا عشرية) যারা ১২ ইমামে বিশ্বাসী। বাংলাদেশে এদের সংখ্যাই বেশি। পুরান ঢাকা, সিলেট এবং খুলনায় এদের বড় বসতি রয়েছে। (২) ইসমাঈলী : বিশেষ করে আগাখানি শী'আ। এরা মূলত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[১]

আশূরা কেন্দ্রিক শী'আ অপসংস্কৃতিসমূহ :

১. তা'যিয়া মিছিল :

মুহাররমের ১০ তারিখে শী'আরা হোসাইন (রা.)-এর প্রতীকী সমাধি বহন করে শোকযাত্রা করে থাকে। একে তা'যিয়া মিছিল বলা হয়। আরবী বা উর্দূতে তা'যিয়া শব্দের অর্থ শোক প্রকাশ করা। শী'আ সম্প্রদায় মুহররম মাসের প্রথম দশদিন কারবালার ঘটনা উপলক্ষে শোক পালন করে এবং আশূরা বা দশম দিনে হোসাইন (রা.)-এর সমাধির প্রতিকৃতি নিয়ে মিছিল করে, কারণ এদিনই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এই মিছিলে লাঠি, বল্লম ও ধারালো অস্ত্র বহন করা হয় এবং 'হায় হোসাইন, হায় হোসাইন' বলে বুক চাপড়ানো হয়। ১০ই মুহাররম ভোরে একটি মিছিল পুরোনো ঢাকার ইমামবারা থেকে বের হয়। এটি নাজিমুদ্দীন রোড, চকবাজার, রহমতগঞ্জ, চাঁদনী ঘাট, উর্দু রোড ও বকশীবাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ইমামবারায় ফিরে আসে।

অতঃপর মুল মিছিলটি দুপুরে ইমামবারা থেকে বের হয়ে বকশীবাজার, হরনাথ ঘোষ রোড, আজিমপুর, নিউ মার্কেট হয়ে ধানমণ্ডি-২ নম্বর সড়কের পশ্চিম প্রান্তের কল্পিত 'কারবালা' প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। এখানে তা'যিয়া বিসর্জনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শোকের সমাপ্তি ঘটে।

শুধু ঢাকা নয়, সমগ্র বাংলাদেশের বড় শহর যেমন চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটেও এই প্রথা পালিত হতে দেখা যায়।

ঐতিহাসিক রেকর্ড অনুযায়ী ১৮ শতকের দিকে এই মিছিলের মূল কেন্দ্র ছিল হোসাইনী দালান থেকে ফরাশগঞ্জ বা আশক জামাদার এলাকা। তবে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং পাকিস্তান আমল পরবর্তী সময়ে মিছিলের গন্তব্য হিসাবে ধানমণ্ডির প্রতীকী কারবালা (জিগাতলা এলাকা সংলগ্ন) অন্তর্ভুক্ত হয়। 'হায় হোসাইন' ধ্বনি এবং বুক চাপড়ে মাতম করার এই সংস্কৃতি মূলত ইরাক ও ইরানের শোক পালনের রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা বাংলাদেশে একটি নিজস্ব রূপ লাভ করেছে।[২]

---

[১] *S. Islam, Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh, 2012. Entry: "Shias" & "Hussaini Dalan"; শরীফ উদ্দিন আহমাদ (সম্পা.), বাংলাপিডিয়া (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১০; ভুক্তি : 'তাজিয়া', 'আশুরা' এবং 'হোসাইনী দালান'; পৃ. ১৭২-১৭৪ (তাজিয়া) এবং ৫০৯-৫১০ (হোসাইনী দালান)।*

[২] *মুনতাসির মামুন, **ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী** (পরিবর্ধিত সংস্করণ), (ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ৯১-৯৫।*

বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘শী‘আদের উদ্ভব ও বিস্তৃতি ইরাকে ও ইরানে হলেও সেখানে এরূপ শোকমিছিলে তা‘যিয়া বহন করা হয় না। ভারতীয় উপমহাদেশে কখন থেকে তা‘যিয়া মিছিলের প্রবর্তন হয়, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। বাংলাদেশে মোগল আমলে বিশেষত শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৫৯ খ্রি.) বাংলার সুবেদার থাকাকালে শী‘আদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত তখনই এখানে তা‘যিয়া মিছিলের প্রচলন হয়। বাদশা আকবরের আমলে আগ্রা দুর্গ থেকে তা‘যিয়া বের হ’ত যা মোগল তা‘যিয়া নামে অভিহিত হয়েছে। শাহ সুজার সময়ে সৈয়দ মীর মুরাদ ১০৫২ হিজরী সনে (১৬৪২ খ্রি.) ঢাকায় ঐতিহাসিক হোসাইনী দালান নির্মাণ করেন। ঢাকার নায়েব-নাযেমদের অধিকাংশ ছিলেন শী‘আ।

তাঁদের দ্বারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ইমামবারা (امام بارہ) (ইমামের আবাস) নির্মিত হয়। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, অষ্টগ্রাম, সৈয়দপুর, সিলেট ইত্যাদি স্থানে ইমামবারা আছে। এটিকে কোথাও হোসাইনিয়া বা আযাখানা (মাতমের স্থান)ও বলা হয়।

তা‘যিয়া মিছিলের বৈশিষ্ট্য হ’ল– ১. হোসাইন (রা.)-এর সমাধির প্রতিকৃতি বহন করা; এটি কাঠ, কাগজ, সোনা, রূপা, মার্বেল পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়। ঢাকার হোসাইনী দালানের তা‘যিয়াটি কাঠ ও রূপার আবরণ দিয়ে তৈরি, যা নবাব সলিমুল্লাহ দান করেন। তা‘যিয়া মিছিলে মাতম করা, বুক চাপড়ানো ও জিঞ্জির দিয়ে পিঠের ওপর আঘাত করে রক্তাক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর কষ্টের সাথে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করা হয়, যাকে শী‘আ পরিভাষায় ‘যঞ্জির যানি’ বা ‘খুনী মাতম’ বলা হয়।

তা‘যিয়া মিছিলের অগ্রভাগে নিশান বহনকারী বাহিনীর পেছনে থাকে বাদ্যকর; তৎপশ্চাতে কয়েকজন লোক লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ও তরবারি চালাতে চালাতে অগ্রসর হয়। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো টুপী ও কালো পোশাক পরিধান এবং কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। মিছিলের সামনে দুটি শিবিকা বা পালকীসহ অশ্বারোহী সৈন্যের সাজে কয়েকজন লোক শোক প্রকাশ করতে করতে অগ্রসর হয় এবং তার পেছনে একদল গায়ক মর্সিয়া বা শোকগান গাইতে থাকে। এভাবে মিছিলটি নিয়ে লোকজন সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং একটি পূর্ব নির্ধারিত স্থানে গিয়ে তা শেষ হয়।[৩]

এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশে শী‘আদের তা‘যিয়া বা শোকমিছিল হয়ে থাকে। যেমন :

(১) ইরান : শী‘আ মতবাদের প্রাণকেন্দ্র ইরানে তা‘যিয়া পালনের ধরণ ভিন্ন। তারা এই দিনে একধরণের ‘তাযিয়েহ’ বা শোকগাথা নাট্য আয়োজন করে, যাতে কারবালার যুদ্ধকে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। এছাড়া ইয়াজদ শহরে নাখল গার্দানির আয়োজন করা হয়, যা মূলত একটি বিশাল কাঠের কাঠামো (যা হোসাইন (রা.)-এর কফিনের প্রতীক) হাযার হাযার মানুষ মিলে বহন করে। এটি অনেকটা আমাদের দেশের তা‘যিয়া মিছিলের মতই।

(২) ইরাক : ইরাকের কারবালাতেই শী‘আদের মূল তীর্থযাত্রা হয়, যেখানে হোসাইন (রা.)-এর সমাধি অবস্থিত। প্রতি বছর আশূরার সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ কারবালায় জমায়েত হয়। আশূরার দিন দুপুরে তাদের বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, যেখানে লক্ষ লক্ষ শী‘আ তীর্থযাত্রী ‘লাব্বাইক ইয়া হোসাইন’ বলে কারবালার উদ্দেশ্যে দৌড়ে যায়। একে তুয়াইরিজ দৌড় বলা হয়। এটি মূলত ঐতিহাসিক সেই ঘটনার স্মরণে করা হয় যখন কারবালার স্থানীয় লোকেরা হোসাইনের সাহায্যে দৌড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পৌঁছানোর আগেই তিনি শহীদ হন। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মানব সমাবেশ হিসাবে পরিচিত।

(৩) পাকিস্তান ও ভারত : লক্ষ্ণৌ, হায়দারাবাদ এবং মুম্বাইয়ে বিশাল তা‘যিয়া মিছিল বের হয়। লক্ষ্ণৌর বড় ইমামবারা থেকে বের হওয়া মিছিলে শী‘আ-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তানে করাচী, লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডিতে বিরাট পরিসরে মিছিলে বুক চাপড়ানো (মাতম) এবং যঞ্জির যানি (রক্তাক্ত মাতম) দেখা যায়।

(৪) লেবানন : বৈরূত এবং নাবাতিয়াহ শহরে হিযবুল্লাহ এবং আমাল মুভমেন্টের নেতৃত্বে বিশাল শোক মিছিল বের হয়। এখানে মিছিল হয় সামরিক বাহিনীর প্যারেডের মত করে এবং হাযার হাযার মানুষ কালো পোশাক পরে শোক প্রকাশ করে।

(৫) পশ্চিমা দেশসমূহ (ইউরোপ ও আমেরিকা)-এর লন্ডন, নিউইয়র্ক, টরন্টো এবং সিডনির মত বড় শহরগুলোতেও এখন বড় আকারে আশূরার মিছিল হয়। লন্ডনের ‘মার্বেল আর্চ’ এলাকায় প্রতি বছর হাযার হাযার শী‘আ জমায়েত হয়ে শোক মিছিল করেন। তবে পশ্চিমা দেশগুলোতে নিরাপত্তার খাতিরে এবং আইনের কারণে সাধারণত ধারালো অস্ত্র দিয়ে রক্ত বের করার (খুনী মাতম) অনুমতি দেওয়া হয় না, তবে এর পরিবর্তে রক্তদানের (Blood Donation) আয়োজন করা হয়।[৪]

২. তাত্বীর/কামা যানি (قمہ زنی/تطبیر) : তলোয়ার বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করা। এটি আশূরার দিনে শী‘আদের সবচেয়ে ভয়াবহ আচার, যাতে শোকপ্রকাশের নামে তলোয়ার বা শিকল দিয়ে নিজের পিঠ ও মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করা হয়। শিশুদেরও এই আচারে অংশ নেওয়ানো হয়। উদ্দেশ্য হোসাইন (রা.)-এর রক্তপাতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা। ইরান, ইরাক, লেবানন, পাকিস্তান ও ভারতে এটি প্রচলিত।[৫]

৩. মর্সিয়া (الْمَرْثِيَةُ)/নওহা (نوحہ) বা বিলাপ ও আহাজারি : এটি আশূরার দিনে শী‘আদের অন্যতম প্রধান আচার, যেখানে কারবালার ঘটনা বর্ণনা করে বিশেষ শোকগীতি

---

৩. *বাংলাপিডিয়া, পৃ. ১৭২-১৭৪।*

৪. *Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., s.v. "Ta῾ziya" by P. Chelkowski; The Encyclopaedia of Islam - EI, Vol. X (10), Pages 406-408 (EI2)।*

৫. *Encyclopaedia Iranica, iranicaonline.org.*

পরিবেশন করা হয়। এতে পেশাদার নওহাখোয়ান (বিলাপকারী) নিয়োগ করা হয়। দলবদ্ধভাবে উচ্চস্বরে কান্না ও আহাজারি করা হয়। বুকে হাত মেরে ও মাথা নাড়িয়ে ছন্দবদ্ধভাবে বিলাপ করা হয়। মসজিদ, ইমামবারা ও রাস্তায় মাইকে সম্প্রচার করা হয়। সাধারণ শোক পালনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কান্নাকাটি, চিৎকার ও শ্লোগান দেওয়া।

শাহাদাতে হোসাইন উপলক্ষে বাংলা গদ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাস ছাড়াও বহু মর্সিয়া কবিতা রচিত হয়েছে। যার উপর মন্তব্য করে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম স্বীয় 'মহররম' কবিতার শেষে বলেছেন, 'ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'। বলা বাহুল্য, হোসাইন (রা.)-এর আদর্শ ও তাঁর ত্যাগকে অনুসরণের কোন অনুষঙ্গ এতে নেই। বরং আছে কেবল শোকের নামে ভান করা, মুখ-বুক চাপড়ানো, রং ছিটানো, নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি। সেই সাথে রয়েছে অতিরঞ্জিত লেখনী ও গাল-গল্পের অনুষ্ঠান সমূহ। অথচ জাতীয় মুক্তির পথ দেখিয়ে মহাকবি আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.) বলেছেন, ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বা'দ। এর অর্থ হ'ল, বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুমিনকে সর্বদা কারবালার ন্যায় চূড়ান্ত ঝুঁকি নিতে হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, কারবালার ঘটনা হক ও বাতিলের লড়াই ছিল।

৪. আরবাঈন যাত্রা : হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের চল্লিশতম দিনে (২০শে ছফর) কারবালায় এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ পায়ে হেঁটে কারবালায় যান এবং মাযার তাওয়াফ করে। এটিকে তারা হজ্জের সমতুল্য মনে করে।

৫. ছাহাবীদের প্রতি গালিগালাজ :

আশূরার অনুষ্ঠানে আবু বকর, উমর ও উছমান (রা.)-কে প্রকাশ্যে গালি দেওয়া ও লা'নত করা। এটি শী'আ আক্বীদার একটি মৌলিক অংশ।

৬. শোকের রং হিসাবে কালো পোশাক :

মুহাররম মাস জুড়ে কালো পোশাক পরিধান করা এবং সকল আনন্দ-উৎসব বর্জন করা। বিবাহ ও খুশির অনুষ্ঠান এই মাসে নিষিদ্ধ মনে করা হয়।

৭. নযর ও তাবাররুক বিতরণ : হোসাইন (রা.)-এর নামে নযর মানা এবং বিশেষ খাবার রান্না করে বিতরণ করা। তারা এই খাবারকে বিশেষ বরকতময় মনে করে।

৮. আলমবরদারী : তারা কারবালার যুদ্ধে ব্যবহৃত পতাকার অনুকৃতি পতাকা তৈরি করে মিছিলে বহন করে এবং তাতে চুম্বন করে সম্মান প্রদর্শন করে।

৯. দুলদুল বের করা : তারা হোসাইনের ঘোড়ার প্রতীক হিসাবে সাজানো ঘোড়া মিছিলে বের করে এবং সেই ঘোড়াকে সম্মান প্রদর্শন করে।

১০. সিনাজানি : আশুরার দিন বুকে হাত মেরে ছন্দবদ্ধভাবে আঘাত করা–যঞ্জিরজানি ও তাত্বীরের হালকা সংস্করণ হিসাবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

১১. শোকসভায় মিথ্যা ও বাড়াবাড়ি : কারবালার ঘটনায় অতিরঞ্জিত ও বানোয়াট বিবরণ যোগ করে বক্তৃতা দেওয়া হয়, যার অধিকাংশেরই ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

১২. আগুনের উপর দিয়ে হাঁটা : কিছু অঞ্চলে হোসাইনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে জ্বলন্ত আগুনের উপর হাঁটার আচার প্রচলিত আছে।

১৩. পানি পান থেকে বিরত থাকা (সাকা-ই সাকিনা) : কারবালায় ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁর পরিবারকে ফোরাত নদীর পানি থেকে বঞ্চিত রাখার স্মরণে অনেকে মুহাররমের বিশেষ দিনগুলোতে পানি পান করেন না। একে বলা হয় 'ফাকা' (পুরো ছিয়াম নয়, তবে তৃষ্ণার্ত থাকা)। বিশেষ করে ১০ই মুহাররম আছরের আগ পর্যন্ত অনেকে পানি পান করেন না। অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করেন না। হোসাইনের কোলে থাকা দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্রের শহীদ হওয়ার স্মরণে এদিন অনেকে শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।[৬]

পর্যালোচনা :

১. হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতকে কেন্দ্র করে শী'আরা যে সকল বিদ'আতী শোকসংস্কৃতি চালু করেছে তার অস্তিত্ব ৩৫২ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও ছিল না। বাংলা অঞ্চলের শাসক-নবাবেরা শী'আ ছিলেন। ফলে এদেশের মুসলমানদের নামে ও আচার-অনুষ্ঠানে শী'আ প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সাথে প্রসার ঘটে আশূরা ও তা'যিয়ার মত শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকান্ড সমূহের। মূলত তা'যিয়া মিছিল পারস্য ও ভারতীয় মূর্তি সংস্কৃতির সংমিশ্রণে তৈরি একটি প্রথা। এটি মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের রথযাত্রার অনুকরণে তৈরি একটি সংস্কৃতি। তা'যিয়াপূজা কবরপূজার শামিল। পৌত্তলিকরা যেমন নিজ হাতে মূর্তি গড়ে তার পূজা করে, ভ্রান্ত মুসলমানরা তেমনি নিজ হাতে 'তা'যিয়া' বানিয়ে তার কাছে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করে। ইসলামে কবরের প্রতিকৃতি তৈরি করা, সেটিকে সম্মান প্রদর্শন করা বা কবরের নামে মানত করা সরাসরি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা লাশ বিহীন কবর যিয়ারত মূর্তিপূজার শামিল। যা নিকৃষ্টতম শিরক। আর আল্লাহ শিরকের গোনাহ কখনো মাফ করেন না' *(নিসা ৪/৪৮)*।[৭]

২. মাতম ও আত্মনির্যাতন (যঞ্জিরযানি) :

শী'আ অপসংস্কৃতির সবচেয়ে বীভৎস রূপ হলো 'যঞ্জিরযানি' বা ধারালো চেইন ও ছুরি দিয়ে নিজের শরীরকে রক্তাক্ত করা। ইসলামে নিজের শরীর আল্লাহ্র আমানত। শোকের নামে নিজেকে রক্তাক্ত করা বা বিলাপ করা জাহেলী আমল। রাসূল (ছা.) বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ 'যে ব্যক্তি শোকে নিজের

---

[৬] *Momen, M. An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism. Yale University Press, (1985) 240-45.*

[৭] *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃ. ১৫।*

গাল চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের মতো চিৎকার করে কাঁদে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’।[৮]

৩. মর্সিয়া ও ইতিহাসের বিকৃতি :

আশূরা উপলক্ষে বিভিন্ন মজলিসে যে করুণ সুরের শোকগাঁথা বা ‘মর্সিয়া’ পাঠ করা হয়, তাতে কারবালার ইতিহাসকে অতিরঞ্জিত ও ভিত্তিহীনভাবে উপস্থাপন করা হয়। এতে জঘন্যভাবে ছাহাবীগণের চরিত্রহরণ করা হয় এবং ইসলামের প্রকৃত জিহাদী চেতনাকে পাশ কাটিয়ে কেবল কান্নাকাটি ও বিলাপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৪. মিথ্যা সাহিত্য : শী‘আ লেখকদের অতিরঞ্জিত লেখনীতে বিভ্রান্ত হয়ে যেমন বহু ইতিহাস লিখিত হয়েছে, তেমনি ‘বিষাদ সিন্ধু’-র ন্যায় সাহিত্য সমূহের মাধ্যমে বহু কল্পকথাও এদেশে চালু হয়েছে। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় বহু বছর যাবৎ শী‘আরা থাকার কারণে হোসাইন ও কারবালা নিয়ে অলৌকিক সব কল্পকাহিনী এদেশের মানুষের মন-মগযে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এছাড়াও তারা সুকৌশলে এদেশের শিক্ষিত সুন্নী মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু পরিভাষা চালু করে দিয়েছে। যেমন হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর নামের পূর্বে ‘ইমাম’ এবং শেষে নবীগণের ন্যায় ‘আলাইহিস সালাম’ বলা হচ্ছে ও সংক্ষেপে (আঃ) লেখা হচ্ছে। এর কারণ এই যে, শী‘আদের আক্বীদা মতে তাদের ‘ইমাম’গণ নবীগণের ন্যায় মা‘ছূম বা নিষ্পাপ। হোসাইন (রাঃ) তাদের অনুসরণীয় বারো ইমামের অন্যতম। তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা মতে তাদের ‘ইমাম’গণ নবীগণের ন্যায় আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে মনোনীত হন। সেকারণ নবীগণের ন্যায় ইমামগণের নামের শেষে তারা ‘আলাইহিস সালাম’ বলেন। অথচ ইমাম খোমেনী (১৯০২-১৯৮৯ খৃ.) স্বীয় বইয়ে লিখেছেন, ‘আমাদের মাযহাবের আবশ্যিক আক্বীদা সমূহের অন্যতম হ’ল এই যে, আমাদের ইমামদের উচ্চমর্যাদায় আল্লাহ্র নৈকট্যশীল কোন ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত কোন রাসূল পৌঁছতে পারেননি’। তিনি আরও বলেন, নিশ্চয়ই ইমামদের শিক্ষাসমূহ কুরআনের শিক্ষাসমূহের ন্যায়। যার বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করা ওয়াজিব’ *(আল-হুকূমাতুল ইসলামিয়াহ ৫২ ও ১৩ পৃ.)*।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বিশুদ্ধ আক্বীদা মতে ছাহাবীগণ ‘মা‘ছূম’ বা নিষ্পাপ নন এবং তাঁরা নবীগণের সমপর্যায়ভুক্ত নন। অতএব সুন্নী আলেম ও বিদ্বানগণের উচিত হবে শী‘আদের সূক্ষ্ম চাতুর্য হ’তে সাবধান থাকা; যেন আমাদের ভাষা চর্চার মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার প্রচার না হয়।[৯]

৫. কারবালা দিবস পালন : আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে নাজাতে মূসা নয় বরং শাহাদাতে কারবালার স্মরণে শোক দিবস হিসাবে পালিত হয়। এখানে শী‘আদের সাথে মিলিয়ে সাধারণ সুন্নীরাও অগণিত শির্ক ও বিদ‘আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। এদিন সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হোসাইনের ভুয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় রাস্তায় তা‘যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভুয়া কবরগুলিকে ‘আত্মা সমূহের অবতরণস্থল’ (مَنازِلُ الْأَرواحِ) বলে ধারণা করা হয়। সেখানে হোসাইনের রূহ হাযির হয় কল্পনা করে তাকে সালাম দেওয়া হয়। তার সামনে মাথা ঝুঁকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এগুলি পরিষ্কারভাবে শিরক। এছাড়া শোকের ভান করে মুখ ও বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। ‘হায় হোসাইন’ ‘হায় হোসাইন’ বলে মাতম করা হয়। শহীদী রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। কেক ও পাউরুটি বানিয়ে ‘বরকতের পিঠা’ বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হোসাইনের নামে পুকুরে ‘মোরগ’ ছুঁড়ে যুবক-যুবতীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ ‘বরকতের মোরগ’ ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে।[১০]

৬. উগ্র শী‘আরা কোন কোন ‘ইমাম বারা’তে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে গালাগালি ও লাঠিপেটা করে এবং অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুকালীন অসুখের সময় জামা‘আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে তিনি খলীফা হন। তার কারণে আলী (রাঃ) ১ম খলীফা হ’তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। হযরত ওমর, ওছমান, মু‘আবিয়া, মুগীরা বিন শো‘বা (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুম) প্রমুখ জলীলুল কৃদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়।[১১]

৭. রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল কেন্দ্রবিন্দু হ’ল শাহাদাতে হোসাইন বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে ‘হক ও বাতিলের’ লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হোসাইনকে ‘মা‘ছূম’ বা নিষ্পাপ ও ইয়াযীদকে ‘মাল‘ঊন’ বা অভিশপ্ত প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

৮. শী‘আদের প্রভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ সুন্নীরা নামের শেষে বরকতের উদ্দেশ্যে আলী, হাসান বা হোসাইন রাখে, যা নিঃসন্দেহে জাহেলী কাজ। আবার অনেকে ইয়াযিদ এবং মু‘আবিয়া নাম রাখাকে ঘৃণ্য মনে করে।

উপসংহার :

ইসলামী শরী‘আতের মূলনীতি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে গিয়ে নতুন কোন ইবাদত বা রীতি প্রবর্তন করলে তা ‘বিদ‘আত’-এর অন্তর্ভুক্ত এবং নিশ্চিতভাবে বর্জনীয়। আশূরা উপলক্ষ্যে শী‘আদের উপরোক্ত কর্মকাণ্ড প্রতিটিই ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট গোমরাহী। শোকদিবস পালনকে ইসলাম

---

[৮] বুখারী হা/১২৯৭; মিশকাত হা/১৭২৫।

[৯] আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃ. ৩১।

[১০] ঐ, পৃ. ১০।

[১১] আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃ. ১১।

কখনই সমর্থন করে না। এটি জাহেলী কাজ। রাসূল (ছা.) ও তাঁর ছাহাবীদের যুগে কখনো কারো মৃত্যুতে এরূপ বিলাপ, চিৎকার বা আত্মবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি।

সুতরাং সঠিক আক্বীদা সম্পন্ন কোন মুসলমানের জন্য এসকল কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, সমর্থন করা, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা কিংবা অর্থ সহযোগিতা করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। অনুরূপভাবে আশূরা দিবসকে কারবালা দিবস বানিয়ে এই উপলক্ষে ‘হক্ব-বাতিলের লড়াই’ শীর্ষক কোন আলোচনা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা যাবে না। কেননা ইসলামে দিবস পালন নেই।

সর্বোপরি এই দিনে আমাদের করণীয় একটাই, আর তা হ’ল যালিম শাসক ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম দু’টি নফল ছিয়াম রাখা। কমপক্ষে ১০ই মুহাররম একটি ছিয়াম পালন করা কর্তব্য। এর বেশি কিছু নয়। সেই সাথে উচিত হবে যালেম ও মাযলূম সকলকে ফেরাঊন ও মূসার উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। কেননা ইতিহাস সাক্ষী, মাযলূম ও সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আ.) আজও বিশ্বজুড়ে নন্দিত ও সম্মানিত; অন্যদিকে ক্ষমতা ও দাপট থাকা সত্ত্বেও যালিম ফেরাঊন আজও ধিকৃত ও অভিশপ্ত। এমনকি সচেতন কোন পিতা তাঁর সন্তানের নাম ঐ নিকৃষ্ট ফেরাঊনের নামে রাখেন না। সুতরাং আশূরায়ে মুহাররমের এই পবিত্রক্ষণে এর সঠিক ইতিহাস জানা এবং সকল প্রকার অপসংস্কৃতি ও বিদ‘আত বর্জন করে বিশুদ্ধ সুন্নাহর পথে ফিরে আসাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন।

দারুল আবরার লাইব্রেরী

এখানে ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর পাঠ্যবই, ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত সকল বই এবং ‘তাফসীর পাবলিকেশন’-এর তাফসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুন ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুন	১৪ যুলহিজ্জাহ	১৮ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৫	০৫:১১	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০৩ জুন	১৬ যুলহিজ্জাহ	২০ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৫	০৫:১১	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৯
০৫ জুন	১৮ যুলহিজ্জাহ	২২ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১১:৫৭	০৩:১৭	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	২০ যুলহিজ্জাহ	২৪ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৫	০৮:১১
০৯ জুন	২২ যুলহিজ্জাহ	২৬ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১২
১১ জুন	২৪ যুলহিজ্জাহ	২৮ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৪	০৫:১১	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৩
১৩ জুন	২৬ যুলহিজ্জাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪
১৫ জুন	২৮ যুলহিজ্জাহ	০১ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১১:৫৯	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৫
১৭ জুন	০১ মুহাররম	০৩ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৪	০৫:১২	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৫
১৯ জুন	০৩ মুহাররম	০৫ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৪	০৫:১২	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৯	০৮:১৬
২১ জুন	০৫ মুহাররম	০৭ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৪৫	০৫:১২	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৪৯	০৮:১৬
২৩ জুন	০৭ মুহাররম	০৯ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৫	০৫:১২	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৭
২৫ জুন	০৯ মুহাররম	১১ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৬	০৫:১৩	১২:০২	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
২৭ জুন	১১ মুহাররম	১৩ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৭	০৫:১৪	১২:০২	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
২৯ জুন	১৩ মুহাররম	১৫ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৭	০৫:১৫	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫০	০৮:১৭

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−২	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	+২	+১	−১	০	−১
শরীয়তপুর	+২	+১	−১	−২	−২
নারায়ণগঞ্জ	০	০	−১	−১	−১
টাঙ্গাইল	০	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৪	−১	০	০	+১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৪	+৪	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	−১	−১	−১
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	০	০
ফরিদপুর	+২	+১	০	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−৩	+২	+৫	+৪	+৬
ময়মনসিংহ	−৪	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	−২	+৩	+৬	+৪	+৬
নেত্রকোণা	−৫	−১	+২	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৩	+৩	+৩
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+৫	+৩	০
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৬	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৪	+২	+২	+১
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৪	+৪	+৩	+৫	+৩
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৩	+৩
খুলনা	+৬	+৪	+২	+১	০
বাগেরহাট	+৬	+৩	+২	০	−১
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৪	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	০	−২	−৩
পটুয়াখালী	+৫	+১	০	−৩	−৪
পিরোজপুর	+৫	+২	+১	−১	−৩
বরিশাল	+৩	০	−১	−২	−৩
ভোলা	+৩	−১	−২	−৫	−৬
বরগুনা	+৬	+১	+১	−৩	−৪

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	০	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	০	+৪	+৭	+৬	+৮
রাজশাহী	+৫	+৮	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৩	+৬	+৭	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+১	+৬	+৯	+৮	+১০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৫	+৯	+১১	+১০	+১২
নওগা	+৩	+৭	+১০	+৮	+১০

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	−২	+৮	+১৪	+১৩	+১৬
দিনাজপুর	+১	+৭	+১২	+১১	+১৩
লালমণিরহাট	−৩	+৫	+১১	+৮	+১২
নীলফামারী	−১	+৭	+১২	+১১	+১৩
গাইবান্ধা	−২	+৪	+৮	+৬	+৮
ঠাকুরগাঁও	+১	+৯	+১৪	+১২	+১৬
রংপুর	−২	+৫	+১০	+৯	+১১
কুড়িগ্রাম	−৪	+৩	+৮	+৭	+১০

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৪	−৪
ফেনী	−২	−৪	−৫	−৬	−৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৪	−৩	−৩	−৩	−২
রাঙ্গামাটি	−৪	−৭	−৮	−১০	−১১
নোয়াখালী	০	−২	−৪	−৬	−৬
চাঁদপুর	০	−১	−৩	−৪	−৩
লক্ষ্মীপুর	+১	−১	−৩	−৪	−৫
চট্টগ্রাম	−১	−৫	−৬	−৯	−১০
কক্সবাজার	+১	−৬	−৫	−১২	−১৪
খাগড়াছড়ি	−৪	−৬	−৭	−৮	−৮
বান্দরবান	−২	−৭	−৮	−১২	−১৩

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−১০	−৬	−৩	−৪	−২
মৌলভীবাযার	−৮	−৫	−৪	−৫	−৩
হবিগঞ্জ	−৬	−৪	−৩	−৩	−২
সুনামগঞ্জ	−৮	−৪	−১	−২	০

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর শারঈ বিধান : একটি পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যা মানুষের পারস্পরিক লেনদেন, আদব-আখলাক এবং সম্মান প্রদর্শনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রদান করেছে। সামাজিক জীবনে একে অপরকে সম্মান জানানো বা অভ্যর্থনা জানানোর অন্যতম একটি মাধ্যম হ'ল 'ক্বিয়াম' বা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা। তবে এই দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর বিষয়টি সবসময় একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রে অতিভক্তি বা জাহেলী রীতিনীতির অনুসরণে মানুষ এমন কিছু করে ফেলে, যা সরাসরি নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাহ ও নির্দেশনার পরিপন্থী। বিশেষ করে অহংকার প্রদর্শন বা রাজা-বাদশাহদের মতো কৃত্রিম সম্মান প্রদর্শনের সংস্কৃতি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন কখন বৈধ, কখন মাকরূহ আর কখন তা সুন্নাহ্র অন্তর্ভুক্ত তা কিতাব ও সুন্নাহ্র নিরিখে জানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। মূলত এটি ব্যক্তির প্রতি অতিনির্ভরতা বা অহমিকা সৃষ্টি করে কি-না, সেটিই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ এবং সালাফে ছালেহীনের কর্মপন্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ের শারঈ ও নৈতিক অবস্থান নিরূপণ করতে প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

কারো সম্মানে দাঁড়ানোর বিধান

কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা কখনো কখনো হারাম হ'লেও আবার কখনো জায়েয বরং মুস্তাহাব। নিম্নে হারাম ও জায়েযের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল।

কারো সম্মানে দাঁড়ানোর নিষিদ্ধ ক্ষেত্রসমূহ :

ক. কেউ বসে থাকা অবস্থায় তার সামনে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অন্যদের দাঁড়িয়ে থাকা :

বিনা প্রয়োজনে কেবল সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বসে থাকা কোন ব্যক্তির সামনে অন্যদের দাঁড়িয়ে থাকা ইসলামে অনুমোদিত নয়। নবী করীম (ছাঃ) স্পষ্টভাবে এই প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই নবী করীম (ছাঃ) যখন বসে ছালাত আদায় করছিলেন, তখন ছাহাবীগণকে তাঁর পেছনে বসে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা দাঁড়িয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন, إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً وَإِنْ صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً وَلاَ تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِس بِعُظَمَائِهَا، 'নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। অতএব তিনি যখন দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেন, তোমরাও দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করো। আর তিনি যখন বসে ছালাত আদায় করেন, তোমরাও বসে ছালাত আদায় করো। তিনি বসে থাকা অবস্থায় তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো না, যেভাবে পারস্যের লোকেরা তাদের মহান ব্যক্তিদের সম্মানে (দাঁড়িয়ে) করে থাকে'।[1]

অন্য হাদীছে এসেছে, اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ، وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাঁর পেছনে ছালাত আদায় করলাম, তখন তিনি বসা ছিলেন। আর আবুবকর (রাঃ) মানুষকে তাঁর তাকবীর শুনাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে আমাদের দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন তিনি আমাদের বসার জন্য ইশারা করলেন। আমরা বসে পড়লাম এবং তাঁর সাথে বসে ছালাত আদায় করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন বললেন, তোমরা তো এখন পারস্য ও রোমের অধিবাসীদের মতো কাজ করতে যাচ্ছিলে; তারা তাদের রাজাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অথচ রাজারা বসে থাকে। তোমরা এমন করো না। তোমরা তোমাদের ইমামদের অনুসরণ করো। ইমাম যদি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেন তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করো, আর যদি তিনি বসে ছালাত আদায় করেন তবে তোমরাও বসে ছালাত আদায় করো'।[2]

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আলবানী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আর তা হ'ল নবী করীম (ছাঃ) সেই সুস্থ ব্যক্তিদের যারা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ে সক্ষম ছিলেন তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি বসে থাকা অবস্থায় তারাও তাঁর সাথে বসেই ছালাত আদায় করেন। এর অর্থ হ'ল, তিনি তাদের ওপর থেকে ছালাতের অন্যতম একটি রুকন বা ফরয ক্বিয়াম (দাঁড়ানো) রহিত করে দিয়েছিলেন। অথচ বিশ্বজাহানের প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন, 'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। কেবল একটি বিশেষ কারণে তিনি এই রুকনটি শিথিল করেছিলেন; আর তা হ'ল যেন সেখানে কোন মূর্তিপূজকসুলভ চিত্র ফুটে না ওঠে, যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ত অত্যন্ত সৎ ও নেক ছিল। তিনি মূলত বাহ্যিক অবস্থাকে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। কারণ বাহ্যিক রূপই হচ্ছে অন্তরের বহিঃপ্রকাশ। তিনি চেয়েছিলেন যেন পারস্যের সম্রাট কিসরার সাথে তাঁর কোন সাদৃশ্য প্রকাশ না পায়, যে কিনা অহংকারবশত বসে থাকত আর তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত।

---

১. মুসনাদে আহমাদ হা/১৪২৪৩; ছহীহুল জামে‘ হা/২৩৫৬।

২. মুসলিম হা/৪১৩; নাসাঈ হা/১২০০।

অথচ নবী করীম (ছাঃ) মা'যূর বা অসুস্থ হওয়ার কারণে বসেছিলেন, অহংকারবশত নয়। এমনকি ছাহাবীগণও তাঁর পেছনে আল্লাহ্র ইবাদত ও সম্মানার্থেই দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এই নিয়তের বড় পার্থক্যের পরেও তিনি তাঁদের বসে পড়ার নির্দেশ দেন। যেন পারস্যের সম্রাটদের সামনে তাদের অনুসারীরা যেভাবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমন কোন দৃশ্য তৈরি না হয়। আমরা যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করি যে, কেবল মুশরিকদের সাদৃশ্য বর্জন করার জন্য প্রত্যেক মুছল্লীর ওপর ফরয করা ক্বিয়াম বা দাঁড়ানোর বিধানকে শিথিল করা হয়েছে। তবে সেই অবস্থার ভয়াবহতা কতটুকু যেখানে মুসলিমরা আল্লাহ্র জন্য নয় বরং গায়রুল্লাহ্র জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে? নিঃসন্দেহে নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন মজলিসে প্রবেশ করতেন, তখন ছাহাবীদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপসন্দ করতেন যদিও তারা ভালোবেসেই তা করতে চাইতেন। বর্তমান প্রেক্ষাপট এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেবল নেতাদের ক্ষেত্রেই নয়, বরং অনেক আলেমে দ্বীন ও মাশায়েখের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তাঁরা মজলিসে প্রবেশ করলে মানুষ দাঁড়িয়ে তাঁদের সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করাকে আবশ্যক মনে করে। অথচ এই ধরনের সম্মান করা থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এটা পসন্দ করে যে মানুষ তার সম্মানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।[৩]

খ. কারো আগমন বা প্রস্থানের সময় কোন কারণ ছাড়াই কেবল সম্মানের খাতিরে দাঁড়িয়ে থাকা :

অর্থাৎ কারো আগমন বা প্রস্থানের সময় মুছাফাহা, সাক্ষাত বা কোন কাজে সহযোগিতার উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল ভক্তি প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা। যেমন ক্লাসরুমে শিক্ষক এলে বা পরীক্ষার হলে পরিদর্শক স্বাক্ষর করতে এলে দাঁড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি। ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর আগমনে দাঁড়াতেন না, কারণ তারা জানতেন যে, তিনি এটি অপসন্দ করেন। এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছ সমূহ প্রণিধানযোগ্য-

(১) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُوا مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছাহাবীগণের কাছে আর কেউ ছিলেন না, তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন তাঁকে আগমন করতে দেখতেন, তখন দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন না; কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি এটি অপসন্দ করেন’।[৪]

(২) আবু মিজলায (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদা মু‘আবিয়া (রাঃ) বাইরে বের হ’লেন। তাঁকে দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এবং ইবনে ছাফওয়ান (রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন মু‘আবিয়া (রাঃ) বললেন, ‘আপনারা বসুন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত বোধ করে যে, মানুষ তার সম্মানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়’।[৫] এর ব্যাখ্যায় ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন, لِأَن هَذَا الْوَعِيد إِنَّمَا توجه للمتكبرين وَإِلَى من يغْضب أَو يسْخط أَن لَا يُقَام لَهُ، ‘কেননা এই ধমকি বা কঠোর সতর্কতা কেবল সেইসব অহংকারী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করেই দেওয়া হয়েছে, যারা তাদের সম্মানে (অন্যরা) দাঁড়িয়ে না থাকলে রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট হন।[৬]

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু‘আবিয়া (রাঃ) বাইরে বের হলেন এবং দেখলেন যে, তাঁর আগমনের কারণে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি তাদের বললেন, ‘আপনারা বসুন। কারণ রাসূলুল্লাহ বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُومَ لَهُ بَنُو آدَمَ، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ‘যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় যে আদম সন্তান তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকুক, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়’।[৭]

(৪) আওযাঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর জনৈক দেহরক্ষী আমাকে বলেছেন, এক জুম‘আর দিনে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) আমাদের সামনে বের হলেন, তখন আমরা তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম। যখন আমরা তাঁকে দেখলাম, তখন (সম্মানার্থে) দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বললেন, إِذَا رَأَيْتُمُونِي فَلَا تَقُومُوا، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا ‘তোমরা যখন আমাকে দেখবে, তখন দাঁড়াবে না; বরং (বসার জন্য) জায়গা প্রশস্ত করে দিও।[৮] এর শিক্ষায় আলবানী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছটি আমাদের দু’টি বিষয়ের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করে। প্রথমত কোন ব্যক্তি মানুষের নিকট আসার সময় তারা তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকুক এটি পসন্দ করা হারাম। এ হাদীছের বক্তব্য এতটাই স্পষ্ট যে, এর জন্য বাড়তি কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত আগন্তুকের জন্য বসে থাকা ব্যক্তিদের দাঁড়িয়ে যাওয়া অপসন্দনীয় (মাকরূহ), যদিও আগন্তুক ব্যক্তি নিজে দাঁড়ানো পসন্দ না করেন। এর উদ্দেশ্য হ’ল সৎকর্মে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মন্দের পথ বন্ধ করা’।[৯]

(৫) ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (রহঃ) বলতেন, أَيُّهَا النَّاسُ، إِنْ تَقُومُوا نَقُمْ، وَإِنْ تَجْلِسُوا نَجْلِسْ، فَإِنَّمَا يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ

---

[৩] তিরমিযী হা/২৭৫৫; মিশকাত হা/৪৬৯৯, সনদ ছহীহ।

[৪] আহমাদ হা/১৩৬৪৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৪৬।

[৫] তিরমিযী হা/২৭৫৫; মিশকাত হা/৪৬৯৯, সনদ ছহীহ।

[৬] উমদাতুল ক্বারী ১৪/২৮৯।

[৭] মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান, আল মুখাল্লিছিয়াত হা/২৯৫৫; ছহীহাহ হা/৩৫৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, সনদ ছহীহ।

[৮] তারীখে দিমাশক হা/৯১১৭, ৬৮/১৮৪; ছহীহাহ হা/৩৫৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, সনদ ছহীহ।

[৯] তারীখে দিমাশক হা/৯১১৭, ৬৮/১৮৪; ছহীহাহ হা/৩৫৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, সনদ ছহীহ।

الْعَالَمِينَ. ‘হে লোকসকল! তোমরা যদি দাঁড়াও তবে আমরাও দাঁড়াব, আর তোমরা যদি বসো তবে আমরাও বসব। কারণ, মানুষ তো কেবল বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের (ইবাদতের) জন্যই দণ্ডায়মান হয়।[১০]

(৬) আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের সামনে বেরিয়ে আসলেন। তখন আমরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বললেন, لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ، يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না যেভাবে অনারবরা (অমুসলিমরা) দাঁড়ায়। তারা একে অপরকে (অতিরিক্ত) সম্মান প্রদর্শনের জন্য এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে’।[১১]

(৭) আলী ইবনুল জা‘দ (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, খলীফা মামুন যখন জহুরিদের (মণি-মুক্তা ব্যবসায়ী) ডেকে আনলেন, তখন তাদের সাথে থাকা মালামাল নিয়ে তিনি দরদাম করছিলেন। এরপর মামুন তাঁর কোন প্রয়োজনে ভেতরে গেলেন এবং পুনরায় (মজলিসে) ফিরে আসলেন। তখন মজলিসে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে গেল, কেবল ইবনুল জা‘দ ছাড়া; তিনি দাঁড়ালেন না। বর্ণনাকারী বলেন, মামুন তাঁর দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকালেন। এরপর তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, হে শায়খ! আপনার সঙ্গীরা যেভাবে দাঁড়ালো, আমাকে দেখে আপনার দাঁড়াতে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, আমি আমীরুল মুমিনীনকে সেই হাদীছের কারণে (অসম্মান থেকে) রক্ষা করেছি, যা আমরা নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করে থাকি। খলীফা মামুন জিজ্ঞেস করলেন, সেই হাদীছটি কী? আলী ইবনুল জা‘দ বললেন, আমি মুবারক বিন ফাযালাকে বলতে শুনেছি, তিনি হাসান (বছরী) থেকে শুনেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় যে মানুষ তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকুক, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়’। বর্ণনাকারী বলেন, মামুন হাদীছটি নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মাথা নিচু করে রইলেন। এরপর মাথা তুলে বললেন, এই শায়খ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে কোন কিছু কেনা হবে না। অতঃপর তিনি সেদিন তাঁর কাছ থেকে ত্রিশ হাযার দীনার সমমূল্যের মালামাল ক্রয় করলেন।[১২]

(৮) আহমদ ইবনে আলী আল-বছরী (রহঃ) বলেন, খলীফা মুতাওয়াক্কিল আহমাদ ইবনুল আদল এবং অন্যান্য আলেমদের কাছে সংবাদ পাঠালেন এবং তাঁদেরকে নিজের প্রাসাদে সমবেত করলেন। এরপর তিনি তাঁদের সামনে বের হলেন (উপস্থিত হলেন)। তখন আহমাদ ইবনুল আদল ছাড়া উপস্থিত সকল মানুষ দাঁড়িয়ে গেল। (এটি দেখে) মুতাওয়াক্কিল ওবায়দুল্লাহকে বললেন, ‘এই ব্যক্তি তো আমাদের আনুগত্যের বায়‘আত স্বীকার করে বলে মনে হচ্ছে না! ওবায়দুল্লাহ (পরিস্থিতি সামাল দিতে) বললেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! বিষয়টি তেমন নয়, বরং তাঁর দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা রয়েছে (তাই তিনি আপনাকে দেখতে পাননি)। তখন আহমাদ ইবনুল আদল (স্পষ্টভাবে) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার দৃষ্টিশক্তিতে কোন সমস্যা নেই। বরং আমি আপনাকে আল্লাহ তা‘আলার আযাব থেকে রক্ষা করেছি। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এটি পসন্দ করে যে মানুষ তার সামনে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়’। (এই কথা শুনে) মুতাওয়াক্কিল এগিয়ে এলেন এবং তাঁর পাশেই বসে পড়লেন।[১৩]

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, لَمْ تَكُنْ عَادَةُ السَّلَفِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ أَنْ يَعْتَادُوا الْقِيَامَ كُلَّمَا يَرَوْنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ ‘নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সালাফদের (পূর্বসূরীদের) এমন অভ্যাস ছিল না যে, তারা নবী করীম (ছাঃ)-কে যখনই দেখতেন তখনই তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন যেমন বর্তমানে অনেক মানুষ করে থাকে’।[১৪] এরপর তিনি বলেন, ‘মানুষের জন্য সমীচীন হ’ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সালাফগণ (পূর্বসূরীগণ) যে আদর্শের ওপর ছিলেন, তা অনুসরণ করা। কেননা তাঁরাই হ’লেন সর্বোত্তম প্রজন্ম। আর সর্বোত্তম কথা হ’ল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ হ’ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেখানো পথ। সুতরাং সৃষ্টির সেরা মানুষের (নবীজি) এবং সর্বোত্তম যুগের মানুষদের আদর্শ ছেড়ে অন্য কোন নিচু স্তরের আদর্শের দিকে কারো ফিরে যাওয়া উচিত নয়। আর যার অনুসরণ করা হয় (যেমন কোন নেতা বা আলেম), তারও উচিত হবে তার সাথীদের মাঝে এই প্রথাকে প্রশ্রয় না দেওয়া; যেন তারা তাকে দেখলেই দাঁড়িয়ে না যায় কেবল সাধারণ সাক্ষাতের সময় (অভ্যর্থনা জানাতে) দাঁড়ানো ছাড়া’।[১৫]

কারো জন্য দাঁড়ানোর বৈধ ক্ষেত্রসমূহ :

ক. আগন্তুকের সাথে সাক্ষাতের জন্য :

আগুন্তুকের সাথে মুছাফাহা করা, তাকে নিজের জায়গা ছেড়ে দেওয়া বা অনুরূপ কোন সৌজন্যমূলক কাজে কোন দোষ নেই। বরং এটি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এবং মেহমানদারীর আদব। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, বিদেশী মেহমান বা কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি হঠাৎ করে আগমন করলে তার সাথে মুছাফাহা বা স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়ানো ও এগিয়ে যাওয়া জায়েয। যেমন; কা‘ব ইবনে মালেক (রাঃ) যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন, তখন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ছাহাবীর অন্যতম ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) মজলিস

---

১০. ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ৬/১৫৮।
১১. আবুদাউদ হা/৫২৩০ সনদ যঈফ হ’লেও মর্ম ছহীহ।
১২. ছহীহাহ হা/৩৫৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১৩.ছহীহাহ হা/৩৫৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১৪. মাজমূউল ফাতাওয়া ১/৩৭৪।
১৫. মাজমূউল ফাতাওয়া ১/৩৭৪।

সূচীপত্র

থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে মুছাফাহা করেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানান’।[১৬]

(১) কা‘ব বিন মালেক (রহঃ) বলেন, ‘অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হ’লাম। পথে দলে দলে মানুষ আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তওবা কবুল হওয়ার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। তাঁরা বলছিলেন, ‘আল্লাহ যে আপনার তওবা কবুল করেছেন, সেজন্য আপনাকে মোবারকবাদ। কা‘ব (রাঃ) বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসে ছিলেন এবং তাঁর চারদিকে লোকজন বসা ছিল। (আমাকে দেখে) তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) দ্রুতবেগে হেঁটে আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং আমার সাথে মুছাফাহা করলেন ও অভিনন্দন জানালেন। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ আমার জন্য উঠে দাঁড়াননি। আমি তালহা (রাঃ)-এর এই সহমর্মিতার কথা কখনো ভুলব না’।[১৭]

(২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ المَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) যখন মদীনায় আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে ছিলেন। যায়েদ এসে দরজায় করাঘাত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (আনন্দে এতটাই দ্রুত) তাঁর দিকে উঠে দাঁড়ালেন যে তাঁর শরীরের চাদরটি ঝুলে যাচ্ছিল। আল্লাহর কসম! আমি এর আগে বা পরে তাঁকে এমন অবস্থায় দেখিনি। এরপর তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুম্বন করলেন’।[১৮]

(৩) এছাড়া বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) ইকরিমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন।[১৯]

(খ) কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার জন্য দাঁড়ানো :

বনু কুরায়যার বিচারক হিসাবে আসার সময় নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশে ছাহাবীগণ সা‘দ ইবনে মু‘আয (রাঃ)-কে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, ‘যখন বনু কুরাইযা (গোত্র) সা‘দ ইবনে মুআ‘য (রাঃ)-এর ফয়ছালা মেনে নিতে সম্মত হ’ল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কাছে লোক পাঠালেন (তাঁকে ডেকে পাঠালেন)। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কাছাকাছিই অবস্থান করছিলেন। অতঃপর তিনি একটি গাধার পিঠে ছওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি নিকটে পৌঁছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত আনছারদের উদ্দেশ্যে বললেন, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাঁড়াও’।[২০] অন্য বর্ণনায় রয়েছে- قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ. فَقَالَ عُمَرُ سَيِّدُنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ أَنْزِلُوهُ. فَأَنْزَلُوهُ ‘তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি উঠে দাঁড়াও এবং তাঁকে (বাহন থেকে) নামাও। তখন উমর (রাঃ) বললেন, ‘আমাদের প্রকৃত নেতা তো মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) পুনরায় বললেন, তাঁকে নামাও। এরপর তাঁরা তাঁকে (বাহন থেকে) নামালেন’।[২১]

(গ) ছোটদের স্নেহ ভালোবাসা প্রদর্শন বা বড়দের শ্রদ্ধা প্রদানের জন্য দাঁড়ানো বা এগিয়ে যাওয়া :

ফাতেমা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানে এবং রাসূল (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের জন্য দাঁড়াতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا ‘ফাতেমা (রাঃ) যখন তাঁর নিকট আসতেন, তখন তিনি তাঁর দিকে উঠে দাঁড়াতেন, তাঁর হাত ধরতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজের বসার স্থানে তাঁকে বসাতেন। অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) যখন ফাতেমার নিকট যেতেন, তখন তিনিও তাঁর দিকে উঠে দাঁড়াতেন, তাঁর হাত ধরতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজের বসার জায়গায় তাঁকে বসাতেন’।[২২]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, فهذه الأحاديث صريحة في جواز مثل هذا وأنه لا يدخل في القيام المكروه ‘সুতরাং এই হাদীছগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এই ধরনের (অভ্যর্থনা বা ভালোবাসার জন্য) উঠে দাঁড়ানো জায়েয এবং এটি সেই অপসন্দনীয় বা মাকরূহ দাঁড়ানোর অন্তর্ভুক্ত নয়’।[২৩]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, ‘আপত্তিজনক বিষয় হ’ল কেবল দাঁড়িয়ে থাকা এবং সেটুকুই (অন্য কিছু না করা)। এটি সমীচীন নয়। অর্থাৎ কেবল সম্মানের খাতিরে দাঁড়িয়ে থাকা। তবে মেহমানকে সম্মান জানানো, তাকে এগিয়ে নিয়ে আসা, তার সাথে মুছাফাহা করা বা অভিবাদন জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া জায়েয।

পক্ষান্তরে অন্য সবাই বসা থাকা অবস্থায় কেবল একজনকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা অথবা মেহমানকে অভ্যর্থনা জানানো বা মুছাফাহা করা ছাড়াই কেবল প্রবেশের সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া অনুচিত। আর এর চেয়েও গুরুতর বিষয় হ’ল, কেউ বসে থাকা অবস্থায় তার পাশে কেবল তাকে সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকা’।[২৪]

---

১৬. বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/২৭৬৯।
১৭. বুখারী হা/৪৪১৮।
১৮. আবুদাউদ হা/২৭৩২; মিশকাত হা/৪৬৮২, সনদ হাসান।
১৯. মাজমূউল ফাতাওয়া ১/৩৭৫।
২০. বুখারী হা/৩০৪৩; মিশকাত হা/৪৬৯৫।
২১. আহমাদ হা/২৫১৪০; ছহীহাহ হা/৬৭।
২২. আবুদাউদ হা/৫২১৭; মিশকাত হা/৪৬৮৯, সনদ ছহীহ।
২৩. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২/৯২।
২৪. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৪/৫২-৫৩।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا الْقِيَامُ لِمَنْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ تَلَقِّيًا لَهُ فَحَسَنٌ. وَإِذَا كَانَ مِنْ عَادَةِ النَّاسِ إِكْرَامُ الْجَائِي بِالْقِيَامِ وَلَوْ تُرِكَ لَا أَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ لِتَرْكِ حَقِّهِ أَوْ قَصْدِ خَفْضِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَادَةَ الْمُوَافِقَةَ لِلسُّنَّةِ فَالْأَصْلَحُ أَنْ يُقَامَ لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ أَصْلَحُ لِذَاتِ الْبَيْنِ وَإِزَالَةِ التَّبَاغُضِ وَالشَّحْنَاءِ، ‘তবে কেউ সফর থেকে ফিরে আসলে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উঠে দাঁড়ানো একটি উত্তম কাজ। আর যদি মানুষের অভ্যাস এমন হয় যে, তারা আগন্তুককে দাঁড়ানোর মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করে এবং সেই দাঁড়ানো ত্যাগ করলে যদি আগন্তুক মনে করে যে তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি কিংবা তাকে খাটো করা হয়েছে, আর সে যদি সুন্নাহ সম্মত সঠিক নিয়মটি না জানে তবে এমন পরিস্থিতিতে তার জন্য উঠে দাঁড়ানোই অধিকতর শ্রেয়। কারণ এটি পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এবং একে অপরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূর করার জন্য অধিকতর উপযুক্ত’।[২৫]

শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, ‘আর কারো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বসে আছে আর অন্যজন তার সম্মানে পাশে দাঁড়িয়ে আছে এমনটি করা নিষেধ। তবে যদি কোন বিশেষ কল্যাণ (মাছলাহাত) বা প্রয়োজন থাকে, তবে তা ভিন্ন কথা। সেই বিশেষ কল্যাণের একটি উদাহরণ হ’ল যদি দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমে কাফের শত্রুদের মনে ত্রাস বা বিরক্তি সৃষ্টি করা যায়। যেমনটি মুগীরা ইবনে শু‘বা (রাঃ) করেছিলেন। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যখন কুরাইশদের প্রতিনিধিরা তাঁর সাথে সন্ধি বা আলোচনার জন্য আসত। এমতাবস্থায় মুগীরা (রাঃ) হাতে তলোয়ার নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর মাথার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এতে একটি বিশেষ কল্যাণ নিহিত ছিল, আর তা হ’ল কাফেরদের মনে ভয় সৃষ্টি করা এবং তাদের সামনে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি তাঁর অনুসারীদের গভীর শ্রদ্ধা ও মার্যাদা ফুটিয়ে তোলা’।[২৬]

আবুল ওয়ালীদ ইবনুল রুশদ (রহঃ) বলেন, কারো সম্মানে ক্বিয়াম বা দাঁড়িয়ে যাওয়া চার প্রকারের হয়ে থাকে; যার মধ্যে প্রথমটি হ’ল-

১. নিষিদ্ধ বা হারাম : এটি ঐ ব্যক্তির জন্য যার মনে এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, মানুষ তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকুক; আর সে এর মাধ্যমে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের ওপর নিজের অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশ করতে চায়।

২. মাকরূহ বা অপসন্দনীয়: এটি ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজে কোন অহংকার বা বড়ত্ব প্রকাশ করে না, কিন্তু ভয় থাকে যে মানুষের এই দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তার মনে আত্মঅহংকার বা কুপ্রবৃত্তি প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া এতে স্বৈরাচারী শাসকদের সাথে সাদৃশ্য তৈরি হওয়ার ভয় থাকে।

৩. জায়েয বা অনুমোদিত: এটি ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে সম্মান ও সদাচারের খাতিরে দাঁড়ানো হয়, অথচ সে নিজে তা চায় না এবং এতে স্বৈরাচারীদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কোন সম্ভাবনাও থাকে না।

৪. মানদূব বা মুস্তাহাব : কেউ সফর থেকে ফিরে আসলে তার আগমনে খুশী হয়ে তাকে সালাম দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া; অথবা কারো কোন নে‘মত লাভ হ’লে তাকে অভিনন্দন জানাতে কিংবা কোন বিপদে পড়লে তাকে সান্ত্বনা (তাযিয়াহ) দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া। এই অভিমতকে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, আইনী, ছাহেবে মির‘আত ও ছাহেবে তোহফা সমর্থন করেছেন।[২৭]

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা হ’তে এটি সুস্পষ্ট যে, কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা ‘ক্বিয়াম’ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ নয়, বরং এর বৈধতা ও অবৈধতা নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়ত, কাজের ধরন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। যদি দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য হয় কেবল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে কাউকে রাজা-বাদশাহদের সদৃশ সম্মান জানানো, তবে তা শরী‘আতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানো, মুছাফাহা করা বা মেহমানদারীর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া কেবল বৈধই নয়, বরং এটি সুন্নাহ ও সালাফদের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। মুমিন হিসাবে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত অতিভক্তি বা লৌকিকতা বর্জন করে প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া। বিশেষ করে যাদের অনুসরণ করা হয়, সেই আলেম, শিক্ষক ও নেতাদের উচিত মানুষকে সুন্নাহ্র সঠিক আদব শিক্ষা দেওয়া, যেন সমাজ থেকে অহংকার ও বিজাতীয় সংস্কৃতির মূলোৎপাটন ঘটে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সুন্নাহ্র ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ আমাদের সর্বক্ষেত্রে সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

---

[২৫] *মাজমূউল ফাতাওয়া ১/৩৭৪।*

[২৬] *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২৪/০২।*

[২৭] *ফাৎহুল বারী ১১/৫১; উমদাতুল ক্বারী ২২/২৫২; তোহফাতুল আহওয়াযী ৮/২৭।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য
যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল(এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

প্রাইভেট নাকি সেল্ফ এডুকেশন

-সারওয়ার মিছবাহ

বর্তমান হালচাল : যোহরের ছালাতের পরে কিছু শিক্ষার্থীকে ব্যাগ কাঁধে হনহন করে হেঁটে যেতে দেখি। আছরের ছালাতের পরেও অনেকের সাথে দেখা হয়। মাগরিব ছালাতের পরেও কিছু ছাত্রকে ব্যাগ কাঁধে রাস্তায় হাঁটতে দেখি। এরা ঐ সকল শিক্ষার্থী, যারা সকাল আটটা থেকে দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ক্লাস করেছে। আমরা যোহরের পরে ঘুমিয়েছি। তারা ঘুমায়নি। আমরা আছরের পরে যখন পূর্ণ রিফ্রেশমেন্ট নিয়ে বের হচ্ছি, তখনও তাদের পিঠ থেকে বইয়ের ব্যাগ নামেনি। এরা সবাই প্রাইভেট পড়ুয়া শিক্ষার্থী। যারা শুধুমাত্র পরীক্ষায় একটু ভাল নম্বর পাওয়ার আশায় তাদের শান্তি-বিশ্রাম সব বিসর্জন দিয়েছে।

প্রথমেই বলি, এই শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের কষ্ট হয়। কারণ আমরা যখন পড়ালেখা করেছি, সেসময়ে আমরা দুপুরে ঘুমিয়েছি। আছর পরে মাঠে খেলেছি। সময় করে বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প করেছি। তবে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী দুপুরে ঘুমায় না। তারা প্রতিদিন বিকেলে খেলে না। তারা বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সাথে গল্প করার কোন সময় পায় না। কেমন যেন দুর্বিষহ এক জীবনযাপন করছে তারা। মাঝে মাঝে ভাবি, আমাদের ছাত্রজীবন যদি এতটা প্রেশারের হ'ত তবে আমরা হয়ত লেখাপড়া শেষ করতে পারতাম না। পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার সার্বক্ষণিক মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে হয়তো পড়ালেখাই বাদ দিয়ে দিতাম।

ইদানীং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাইভেটের এমনই প্রভাব যে, অভিভাবকগণ সন্তান ভর্তি করার পরে সর্বপ্রথম প্রাইভেট শিক্ষক খোঁজেন। অথচ তাদের সন্তান এখনো একদিনও ক্লাস করেনি! এখনই তাদের প্রাইভেট নিয়ে মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে। তারা মনে করেন, কোন শিক্ষকের কাছে যদি প্রাইভেট দেয়া হয় তবে তার কাছে থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সবরকমের সহায়তা পাওয়া যাবে। তিনি সন্তানের সুবিধা-অসুবিধা বুঝবেন। ছুটি-ছাটার ব্যবস্থা করবেন। পরীক্ষার সময় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিবেন। আর হচ্ছেও তাই। শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়া শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করছে। বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে, প্রাইভেটের মাধ্যমে তারা অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে। ফলত এর মাধ্যমে শিক্ষকগণ শ্রদ্ধার আসন থেকে নেমে হয়েছেন 'কেয়ারটেকার'। এই বিষয়ে একটু পরে আসছি।

আমাদের অনেক অভিভাবক শুধুমাত্র এজন্য সন্তানকে প্রাইভেটে দেন, যেন কষ্ট করে নিজেকে পড়তে বসাতে না হয়। এর মাধ্যমে তারা নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছেন। কারণ, শিশু শ্রেণী থেকে প্রাইভেট পড়তে পড়তে সন্তানের মনে এই ধারনা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, 'প্রাইভেট ছাড়া পড়া যায় না'। ফলে উচ্চবিত্ত অভিভাবকগণ যখন সময়ের অভাবে বা একটু অবসর সময় পার করার জন্য নিজের মেধাবী সন্তানকে প্রাইভেটে দিচ্ছেন, তখন বর্তমান মূল্যস্ফীতির বাজারে সন্তানদের প্রাইভেট বা কোচিংয়ের বিপুল ব্যয় মেটাতে গিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে চরমভাবে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেক অভিভাবক নিজেদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো বিসর্জন দিয়ে এই ব্যয়ভার বহন করছেন। 'অন্যের সন্তান প্রাইভেট পড়ছে, আমার সন্তান না পড়লে পিছিয়ে পড়বে'–এই ভীতির কারণে অভিভাবকরা সকল কষ্ট মেনে নিচ্ছেন।

প্রাইভেটের কারণে যা যা হারালাম : প্রাইভেট সিস্টেম আমাদের শিক্ষকতার মহান পেশায় চুনকালি লাগিয়েছে। এটা এখন আর কোন 'মহান পেশা' নয়। কারণ শিক্ষকগণ যখন উপরী উপার্জনের একমাত্র পথ হিসাবে প্রাইভেটকেই বেছে নেন তখন আর মহান পেশা থাকে না। এতে তার সৃজনশীলতাও নষ্ট হয়ে যায়। তিনি পাঠ্যবইয়ের মলাটের মাঝে বন্দী হয়ে যান। পাশাপাশি তিনি আর নীতিবানও থাকতে পারেন না। তিনি শিক্ষাকে সহজ করার স্থানে কঠিন করার কথা ভাবেন। কারণ শিক্ষা যদি সহজ হয়ে যায় তবে প্রাইভেটের চাহিদা কমে যাবে। শ্রেণীকক্ষেই যদি শিক্ষার্থীদের সকল চাহিদা পূরণ হয়ে যায় তবে তারা আর প্রাইভেটের প্রয়োজন অনুভব করবে না। তাই শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষের পাঠদানে নিজেদের সেরাটা দেন না, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের কাছে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়। এটাই সবচেয়ে দুঃখজনক। প্রাইভেটের প্রভাবে পাঠদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। পরীক্ষার নম্বর প্রদানে সমতা রক্ষা করা কঠিন হয়। সর্বোপরি শিক্ষক তার আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলেন। তিনি তার শ্রেণীকক্ষেও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না।

প্রাইভেট আমাদের শিক্ষার্থীদের সময়গুলো কেড়ে নিচ্ছে। তাদেরকে জ্ঞানার্জনের পথ না দেখিয়ে শুধু পরীক্ষামুখী করে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। যেখানে শিক্ষার্থীর মূল কাজ হ'ল 'শেখা' সেখানে প্রাইভেট পড়ানোর মূল ফোকাস থাকে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া। ফলে মনের অজান্তেই শিক্ষার্থীরা নোট বা সাজেশনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পড়ালেখার মূল উদ্দেশ্য কি, সেটা তারা কখনোই বুঝে ওঠে না। প্রাইভেট পদ্ধতির জাঁতাকলে পড়ে এরা 'তালিবুল ইলম' নয় বরং 'তালিবুদ দারাজাত' বা 'তালিবুর রক্বম' হয়ে যায়। এরা কখনোই জ্ঞান অন্বেষণ করে না। এরা সর্বদা পরীক্ষার ফলাফলের পেছনে ছুটে বেড়ায়। বছরের পর বছর লেখাপড়া করে কি শিখলাম, কি পেলাম, কি হারালাম; এগুলো হিসাব করার ফুরসত তাদের হয় না।

দেখা গেছে, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকেও শিক্ষার্থীরা নিজের যে কোন বিষয়ের পাঠ্যবই হাতে নিয়ে বলতে পারে না যে, 'এই বই পড়ার পরে আমার এই যোগ্যতা তৈরি হবে'। তারা মনে করে, 'পড়ার উদ্দেশ্য কেবলই পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া। এই ভাল নম্বরই একদিন সৌভাগ্য এনে দিবে'। যা একটি মিষ্টি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর প্রাইভেট সেন্টার হ'ল এমন একটি জায়গা যা তাকে সর্বদা মনে করিয়ে দিতে থাকে, 'তোমাকে

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

পরীক্ষায় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকতেই হবে’। ফলে শিক্ষার্থীরা এক তীব্র ও অস্বাস্থ্যকর মানসিক চাপে থাকে। তাদের মাঝে তৈরি হয় হতাশা ও বিষণ্নতা। জ্ঞানার্জনের প্রকৃত স্বাদ তারা কোনদিনই পায় না।

এই প্রাইভেট সিস্টেম আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থী দিয়ে সাজানো শ্রেণীকক্ষ কেড়ে নিয়েছে। এখন শ্রেণীকক্ষে দেখা যায়, শিক্ষক পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে বসে থাকে। পাশের শিক্ষার্থীর সাথে গল্প করে। তারা মনে করে, ‘এই পড়াগুলো তো আমাকে বিকেলে প্রাইভেটে গিয়ে আবার পড়তেই হবে। প্রাইভেট টিচার তো বুঝিয়েই দিবেন। একই পড়া কতবার বুঝব! এখন একটু গল্প করি। এখন আমার কাজ শুধু কোথায় পড়া দিল তা জেনে নেয়া। বাকী কাজ প্রাইভেট শিক্ষক করে দিবেন’। শিক্ষার্থীদের এই মানসিকতার কারণে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে আগ্রহী শিক্ষকগণ হতাশায় ভোগেন। কারণ শিক্ষার্থী যদি অমনোযোগী হয় তবে পড়া বোঝানো যায় না।

শিক্ষক ক্লাসে পড়া বুঝনোর সময় যখন ক্লাসের মেধাবী শিক্ষার্থীরা গল্প করে, আর শিক্ষকও জানেন, ‘তারা কেন অমনোযোগী’ তখন সত্যিই কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। এই দুঃখ কাউকে বলা যায় না। কারণ এই অভিযোগ করলে কর্তৃপক্ষ ভাবেন, ‘এই শিক্ষক শ্রেণীকক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না’। তাই শিক্ষকগণ আর অভিযোগ করেন না। একসময় তারা শ্রেণীকক্ষে পড়া বোঝানো ছেড়ে দেন। এভাবেই প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল পরীক্ষা দেওয়া এবং সনদ গ্রহণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তারা একাধিক প্রাইভেট শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে এগিয়ে যায়; অন্যদিকে মেধা থাকা সত্ত্বেও কেবল অর্থের অভাবে অনেক শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে। শ্রেণীকক্ষে তাদের পিপাসা নিবারণ হয় না।

এই সিস্টেম আমাদের শিক্ষার্থীদের পঙ্গু করে দিয়েছে। প্রাইভেট পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা হয়ে যাচ্ছে এন্টিবায়েটিক সেবন করে বেঁচে থাকা রোগীর মত। কখনো যদি প্রাইভেট না থাকে তবে যেন এদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। কত দ্রুত আরেকজন শিক্ষক দেখে প্রাইভেট দেয়া যায়, সেটাই অভিভাবকদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই ধরনের শিক্ষার্থীরা নিজ যোগ্যতায় একটি কিতাব বুঝতে পারে না। একটি সমস্যা সমাধান করতে পারে না। এরা ভবিষ্যতে গবেষক হ’তে পারে না। কারণ গবেষক হ’তে সেল্ফ এডুকেশনে অভ্যস্ত হ’তে হয়। যে পদ্ধতির সাথে তারা কোনদিন পরিচিতই হয়নি। এজন্যই বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে যখন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করতে শিখছে, তখন আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের কেবল সেই আবিষ্কারের কাহিনীগুলোই পড়াচ্ছি। এর বেশী চাপ তারা নিতে পারছে না।

সেল্ফ এডুকেশন : প্রাইভেট নামের এই মহামারি বন্ধ করতে হ’লে আগে শিক্ষার্থীদের প্রাইভেটের বিকল্প কিছু দিতে হবে। আর প্রাইভেটের উত্তম বিকল্প হ’ল ‘সেল্ফ এডুকেশন’। আমরা এই পদ্ধতিতেই পড়াশোনা করেছি। তবে সমস্যা হ’ল, সেল্ফ এডুকেশনের মূলমন্ত্র ‘শিক্ষার্থীর আগ্রহ’। সেটা যদি না থাকে তবে এই পদ্ধতি কাজে আসে না। আর বর্তমানে আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়াশোনার আগ্রহ নেই বললেই চলে। তবুও বিষয়টির সাথে তাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। যেন আগ্রহীরা এই পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে পারে।

সেল্ফ এডুকেশন হ’ল নিজে পড়ে শেখা। সহজ কথায়, কারো সাহায্য না নিয়ে নিজেই পড়ালেখার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা বাড়ানো। এই পদ্ধতিই শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এর শুরুটা কষ্টকর হ’লেও ফল দীর্ঘমেয়াদী। কারণ সেল্ফ এডুকেশন একজন শিক্ষার্থীকে একাডেমিকভাবে মযবূত করে গড়ে তোলে। সেল্ফ এডুকেশনের সবচেয়ে বড় শত্রু হ’ল প্রাইভেট সিস্টেম। কারণ যেখানে সেল্ফ এডুকেশন একজন শিক্ষার্থীকে স্বনির্ভর হ’তে শেখায়, সেখানে প্রাইভেট সিস্টেম তাকে আজীবনের মত পরনির্ভর করে তোলে। কেউ বুঝিয়ে দিলে তবেই সে কোন পাঠ বুঝতে পারে।

সেল্ফ এডুকেশনের কয়েকটি ধাপ আছে। প্রাথমিকভাবে একজন শিক্ষার্থী ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের আলোচনা শুনবে এবং এতেই সে পাঠ বুঝে যাবে। কারণ শিক্ষক অবশ্যই ক্লাসে পড়াগুলো যথাসাধ্য বোঝানোর চেষ্টা করেন। তবে শিক্ষকের আলোচনা যদি শিক্ষার্থীর কাছে অস্পষ্ট থাকে তখনই সেল্ফ এডুকেশনের প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীকে তখন ক্লাসে নোট খাতা নিয়ে বসতে হয় এবং শিক্ষকের কথাগুলো নোট করতে হয়। কোন আলোচনা যদি অস্পষ্ট থাকে তবে ক্লাস শেষে শিক্ষককে সেই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করতে হয়। এতুটুকু যত্ন নিলেই অনেকে শতভাগ পড়া বুঝে যায়।

তারপরও যদি কেউ না বোঝে তবে তাকে এগুলোর জন্য বাড়তি সময় দিতে হয়। এর পদ্ধতি হ’ল, না বোঝা বিষয়গুলো আলাদাভাবে নোট করে কোন শিক্ষক বা বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে বুঝিয়ে নেয়া। তাতেও যদি না হয় তবে বুঝতে হবে, সাবজেক্টের ভিত্তি মযবূত নয়। আগে ভিত্তি মযবূত করতে হবে। সেল্ফ এডুকেশনে যে কোন বিষয়ের ভিত্তি মযবূত করার জন্য কারিকুলাম বহির্ভূত বইয়ের সহযোগিতা নিতে হয়। বর্তমানে যে কোন বিষয়ের দূর্বলতা দূর করার জন্য বাজারে ফর্মুলা সমৃদ্ধ বহু বই পাওয়া যায়। অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে সেই বইগুলো সংগ্রহ করে নিয়মিত অধ্যয়ন করলে দুই তিন মাসের মধ্যে একটি বিষয়ের দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রয়োজন হ’লে যে বিষয়গুলোতে দূর্বলতা আছে সে বিষয়ে ফর্মুলা সমৃদ্ধ বই কিনে গ্রুপ স্টাডি বা তাকরার করতে হবে। এটাও অত্যন্ত ফলপ্রসূ। যদি এতটুকু যোগ্যতাও না থাকে তবে গাইড কিনতে হবে। গাইড দেখে ক্লাসের পড়া করতে হবে। যদি কেউ উল্লেখিত সবগুলো পন্থায় অপারগ হয় এবং গাইড থেকেও পড়া করতে না পারে তবে তার জন্য প্রাইভেটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারপরও সেটা গদবাধা প্রাইভেট নয়, বরং এভাবে প্রাইভেট দিতে হবে যে, প্রাইভেট শিক্ষক যেন তিন মাসের মধ্যে তার নির্দিষ্ট বিষয়ের দুর্বলতা দূর করে দেন। অর্থাৎ ক্লাসের বই না পড়িয়ে ভিত্তি মযবূত করায়

মনোনিবেশ করেন। দুর্বলতা দূর না করে শুধু ক্লাসের পড়াগুলো দ্বিতীয়বার পড়িয়ে দেয়া প্রাইভেট অবশ্যই বর্জনীয়।

আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের সেল্ফ এডুকেশনের সাথে পরিচয় করাতে হবে। প্রয়োজনে দু'একদিনের কর্মশালা রাখতে হবে। দুর্বলতা দূর করার জন্য কিভাবে বিষয়ভিত্তিক বই চয়ন করতে হয়। বইগুলো কখন, কিভাবে পড়তে হয়। দুর্বলতা দূর করতে ছুটিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে। তাদের শেখাতে হবে, সামনের পাঠ মুতালা'আ করার পদ্ধতি কী। তাহ'লে আশা করা যায়, প্রাইভেটের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশেই কমে আসবে। কারণ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, 'ক্লাসে শিক্ষকদের প্রশ্ন করলে তারা প্রাইভেটে আসতে বলেন'। এই দোষ তো শিক্ষার্থীদের। তারা নিজেদেরকে কেন ভোঁতা করে রাখবে?

আমাদের সময় যে শিক্ষার্থীরা সেল্ফ এডুকেশনে অভ্যস্ত ছিল, যারা সামনের পাঠ মুতালা'আ করে ক্লাসে আসত, শিক্ষকগণ তাদের প্রাইভেটে আসতে বলা তো দূর কী বাত! তাদের সাথে লিয়াজু মেন্টেইন করে চলতেন। অনেক বড়ভাইকে দেখেছি, যারা শিক্ষকের চেয়ে বেশী মুতালা'আ করে ক্লাসে বসতেন। শিক্ষকগণ পড়ানোর সময় দ্বিধায় থাকতেন যে, শিক্ষার্থীরা কি না কি প্রশ্ন করে বসে! শিক্ষক প্রাইভেটে আসতে বলার তো কোন প্রশ্নই আসে না। আবার শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, 'শিক্ষকগণ ক্লাসে মুতালা'আ করে আসেন না'। আমরা শিক্ষার্থীদের বলব, এটা কোন অভিযোগ করার বিষয় নয়। অবশ্যই সেই ক্লাসের শিক্ষার্থীরা পাথরের মত নিথর। তাদের কাছে হাঁ-না সব সমান। কাজেই শিক্ষক মুতালা'আ করে আসার প্রয়োজনবোধ করেন না। শিক্ষার্থীরা যদি সামনের পাঠ মুতালা'আ করে আসা শুরু করে তবে শিক্ষকও মুতালা'আ করে আসতে বাধ্য হবেন।

আত্মসমালোচনা ও পদক্ষেপ : শুধু শিক্ষার্থীরা পরিবর্তন হ'লেই যে প্রাইভেট বন্ধ হয়ে যাবে, এমন নয়। শিক্ষার্থীদের সচেতন করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান প্রধানেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আমরা মনে করি, এই অবস্থার পরিবর্তনে প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির পদক্ষেপ সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা এখানে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা যখনই এই কথা বলি যে, 'পদক্ষেপ নিতে হবে' তখনই প্রমাণ হয়ে যায় যে, সে বিষয়ে ঘাটতি আছে। সুতরাং এগুলো কোন সমালোচনা নয় বরং আত্মসমালোচনা বা 'মুহাসাবা'।

প্রাইভেট বন্ধের বিষয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে প্রশাসনিক দুর্বলতা বা আপোসকামিতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পথ বন্ধ করে একটি সুস্থ, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতি সুধারণা রাখা অবশ্যই বর্জনীয়। 'আমরাই সেরা' এই মানসিকতা রাখা যাবে না, বরং 'আমাদেরকে সেরা হ'তে হবে' এমন মানসিকতাই কাম্য। এক্ষেত্রে আমরা নিজেদের অর্জনগুলো সামনে না রেখে ঘাটতিগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

যেমন আমাদের গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব দেখা যায়। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক তো নেই বললেই চলে। এজন্য শিক্ষার্থীরা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শিক্ষা অর্জনের জন্য শহরমুখী হয়। কারণ শহরের উন্নত প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষক রয়েছেন। তারা খুব সুন্দরভাবে পড়া বোঝাতে পারেন। তাদের কাছে পড়লে তুলনামূলক ভাল পড়া বোঝা যাবে। আরো বেশী যোগ্য হওয়া যাবে। এজন্যই শিক্ষার্থীরা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে। পড়ালেখা ছাড়া শুধু ভাল খেতে-পরতে কেউ শহরে আসে বলে আমরা জানি না।

এখন উন্নত প্রতিষ্ঠান হিসাবে যদি আমরা মানসম্মত পড়ালেখাই নিশ্চিত করতে না পারি, তবে আমাদের স্বার্থকতা কোথায়! মেধা যাচাই করে ভর্তি নেয়া শিক্ষার্থীগুলোরই যদি চার/পাঁচটি প্রাইভেট পড়া লাগে তবে আমরা তাদেরকে কি শিখাই? আমাদের শিক্ষাদান কি এতই ভঙ্গুর? যদি উন্নত প্রতিষ্ঠানে পড়েও প্রাইভেটের প্রয়োজন হয়, তবে প্রতিষ্ঠান উন্নত হ'ল কই? শুধু জুতা-মোজা আর উন্নত ড্রেসকোডই কি প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করে? না! প্রতিষ্ঠানকে কেবল একটি জিনিসই উন্নত করতে পারে। তা হ'ল পড়ালেখার মান। সেই মান ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদেরই।

আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট বা কোচিংয়ে পড়াতে পারবেন না। শিক্ষক নিয়োগের চুক্তিতেই পেশাদারী নৈতিকতা এবং জবাবদিহিতার শর্তগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে যৌক্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিধান রাখতে হবে। তবে এই নিয়মের ওপর কঠোরতা আরোপ করা তখনই সম্ভব হবে, যখন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত সম্মানীতে শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। কারণ 'প্রাইভেট পড়াচ্ছেন কেন'? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন শিক্ষক যদি বলেন, 'আমি মাসের শুরুতে বেতন তুলে বাড়ী ভাড়া দিয়ে বাকী টাকার বাজার করি। তাতে ১৫ দিনের চাল-ডাল হয়। এখন মাসের ২০ তারিখ। আমার বাড়ীতে চাল নেই'। তাহ'লে শিক্ষকদের এই প্রশ্ন না করাই যুক্তিযুক্ত। সিস্টেম যেভাবে চলছে সেভাবেই চলতে দেয়াই ভাল। কারণ যে সিস্টেম কোটি টাকার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তা শুধু মুখের শুকনো কথায় থেমে যাবে এটা আশা করা যায় না।

আমরা যেটা করতে পারি, যে সকল শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে সর্বোত্তম মেধা ও শ্রম দিচ্ছেন, যাদের শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট ছাড়াই ভাল ফলাফল করছে, যারা সারা বছরে নিজের প্রাপ্য ছুটিটাও গ্রহণ করছেন না, আরো বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন্যদের তুলনায় অধিক শ্রম দিচ্ছেন, তাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিশেষ আর্থিক বা সম্মানসূচক প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা। কারণ একজন শিক্ষক যখন দেখবেন, তিনি ক্লাসে অনেক শ্রম দেন। আরেকজন শিক্ষক ক্লাসে কোন শ্রম না দিয়ে তার সমান বা অধিক মূল্যায়িত হচ্ছেন, তখন শ্রম

দেয়ার আগ্রহ এমনিতেই হারিয়ে যাবে। এটা অবশ্য হঠাৎই হারিয়ে যাবে না, একটু একটু করে হারাবে। তখন দেখা যাবে, পুরো একটি শিক্ষক প্যানেল সব ফাঁকিবাজে ভরে গেছে। তবে তাদেরকে ফাঁকিবাজ বলার আগে এটাও দেখতে হবে যে, পরিশ্রমীদের শ্রম আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করেছি।

অর্থনৈতিক বিষয়ে যদি আমরা একটি সন্তোষজনক স্থানে অবস্থান করতে পারি, তখন আমাদের কাজ হবে শিক্ষকদের মাঝে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করা। এই বিষয়েও প্রতিষ্ঠান প্রধান বা পরিচালকগণের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। কারণ শিক্ষকগণ মূলত এখান থেকেই আত্মসম্মান হারান। আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাব, বিভিন্ন কোম্পানী তাদের পণ্য বিক্রির জন্য কর্মচারী রাখে। একটি কোম্পানীর কাছে কাস্টমার সর্বদা মুখ্য বিষয়। কারণ কাস্টমারের মাধ্যমেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে। এজন্য কোন কাস্টমার যদি তাদের কর্মচারীর সাথে দুর্ব্যবহারও করে তবুও কোম্পানী এটাকে সহজেই মেনে নেয়। তবে কোন কর্মচারী যদি কাস্টমারের সাথে দুর্ব্যবহার করে তবে তাকে সে বেলাতেই চাকুরি হারাতে হয়।

এই চিরচেনা পদ্ধতিতে যদি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও পরিচালিত হয় তবে সেখানে আমরা যতই ‘শিক্ষাগুরুর মর্যাদার বাণী’ শোনাই না কেন, শিক্ষকদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হবে না। কারণ তারা মনে করবেন, শিক্ষকতাও আর দশটা চাকুরির মতই। এখানে ‘মহান পেশা’ বলতে কিছু নেই। আর এই মানসিকতা জন্ম নিবে তখনই, যখন তাদের সাথে আর দশটা পেশার কর্মচারীর মত আচারণ করা হবে। এজন্য শিক্ষকগণের সাথে সম্মানসূচক আচরণ করতে হবে। যা আমাদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই আজ অনুপস্থিত।

একজন শিক্ষকের কাছে সবচেয়ে দামী জিনিস হ’ল সম্মান। শিক্ষক সম্মানীতে মানিয়ে নিতে পারেন, তবে সম্মানে মানিয়ে নিতে পারেন না। তাদেরকে অবশ্যই সম্মান দিতে হবে। এমন কাজ করতে হবে, যেন শিক্ষকগণ বুঝতে পারেন যে, তাদেরকে সম্মান দেয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের আবাসন, খাবার, প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত আরো অন্যান্য বিষয়, আর শিক্ষকদের আবাসন, খাবার ইত্যাদি যদি একই মানের হয় তবে এটাকে সম্মান দেয়া বলে না। প্রতিষ্ঠানের যদি কোনই সামর্থ্য না থাকে তবে শিক্ষকদের থালায় অতিরিক্ত এক টুকরো লেবু দিয়ে বুঝাতে হবে যে, আপনারা আমাদের কাছে সম্মানিত। তুলনামূলক নতুন একটি ফ্যান তাদের ঘরে লাগিয়ে বুঝাতে হবে, শিক্ষকগণ শ্রদ্ধার পাত্র। শিক্ষকগণ যদি দেখেন, কর্তৃপক্ষ তার সাধ্যানুযায়ী তাদের সম্মান করেছেন তবে আন্তরিকতা এমনিতেই আসবে। কারণ তারা তো মানুষ। তারা তো এগুলো অনুভব করেন। এছাড়া শুধু ‘আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হোন’ বললেই তারা পরিবর্তন হবেন না।

যখন তারা নিজেদের আত্মসম্মান বুঝবেন, প্রাইভেট না পড়িয়েই সংসারও চলবে তখন তারাই আদর্শের মূর্তপ্রতীক হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তখন এই শিক্ষকদের দিয়েই ওভার টাইম ক্লাসের ব্যবস্থা করা যাবে। ফ্রিতে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা যাবে। যে শিক্ষকগণ শিক্ষা কঠিন করতে চাইতেন, ব্যবসার মানসিকতা রাখতেন, তারাই সবার আগে এসে বলবেন, কার কি সমস্যা আছে, আমার কাছে এসো। তবে এই বিশাল পরিবর্তন আসতে সময় লাগবে। গাছ যদি আজ লাগানো হয় তবে ফল তিন বছর পরে আসবে। আর গাছই যদি তিন বছর পরে লাগানো হয় তবে ফলের দেখা পেতে ছয় বছর সময় লাগবে।

কর্তৃপক্ষের এমন পদক্ষেপ গ্রহণের পরেও যদি শিক্ষকগণের মাঝে প্রাইভেট পড়ানোর ব্যাধি দেখা যায় তবে বুঝে নিতে হবে, তারা শিক্ষক নন। তাদেরকে এই পেশা থেকে দ্রুত অব্যাহতি নেয়ার পরামর্শ দিতে হবে। প্রাইভেট বন্ধে কর্তৃপক্ষ যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন, কোন শিক্ষক যদি তা ব্যহত করেন তবে এই বিষয়েও কর্তৃপক্ষের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলব, উল্লেখিত প্রবন্ধে আমরা যে ছোট ছোট সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, এই সবগুলোই প্রাইভেট সিস্টেম প্রতিষ্ঠার একেকটি অংশ। এটি পরিপূর্ণ একটি প্যাকেজ। বাহ্যিকভাবে মনে হ’তে পারে, এর সাথে প্রাইভেটের কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে এগুলোর সাথে প্রাইভেটের গভীর সম্পর্ক অনুভব করেছি। মহান আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করছি, তিনি যেন আমাদের এই প্রাইভেট নামক মহামারী দমনে সফল পদক্ষেপ গ্রহণের তাওফীক দান করেন। আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু’আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায ‘আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী’, নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ’তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

তাহিইয়াতুল মাসজিদ আদায়ে অভ্যস্ত হৌন!

*- ড. ইহসান ইলাহী যহীর**

পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা‘আলার সবচেয়ে প্রিয় স্থান হ’ল মসজিদ। এটি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুমিনের সর্বোচ্চ আনুগত্য নিবেদনের স্থান। এটি মুমিনের হৃদয়ের প্রশান্তির ঠিকানা, দুনিয়ার শত ব্যস্ততা ও কোলাহলের মাঝে এক টুকরো জান্নাত। আমরা যখন কোন সম্মানিত ব্যক্তির বাড়িতে অতিথি হয়ে যাই, তখন প্রথমেই তাকে সালাম বা অভিবাদন জানাই। ঠিক তেমনি মহান রাব্বুল ‘আলামীনের ঘরে প্রবেশ করার পর সেই ঘরে বসার জন্য দুই রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মসজিদ’ ছালাত আদায় করতে হয়। খুব সহজ ও ছোট্ট এই আমলটির মাঝে লুকিয়ে আছে আল্লাহর প্রতি বান্দার অগাধ প্রেম, বিনয় এবং আত্মিক প্রস্তুতির এক গভীর দর্শন।

‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ পরিচিতি : ‘তাহিইয়াতুন’ শব্দের অর্থ উপহার, অভিবাদন, উপঢৌকন বা সালাম। আর ‘মাসজিদ’ অর্থ সিজদার স্থান। পারিভাষিক অর্থে, মসজিদে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যে দুই রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ ছালাত বলা হয়। এই ছালাতকে অন্য নামে ‘দুখূলুল মাসজিদ’ বা মসজিদে প্রবেশের ছালাতও বলে।

‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’-এর হুকুম : ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সুতরাং মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসা উচিত নয়।[১] এমনকি জুম‘আর খুৎবা চলাকালীন সময়েও কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে রাসূল (ছাঃ) ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[২] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ আদায় না করাকে ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত সাব্যস্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. ‘ক্বিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হ’ল, মানুষ মসজিদে প্রবেশ করবে, অথচ দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে না’।[৩]

তাহিইয়াতুল মাসজিদ আদায়ের সময় : মসজিদে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বে এই ছালাত পড়তে হয়। তবে বসে পড়ার পর মনে পড়লে বা কেউ ভুলক্রমে বসে পড়লে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে নেওয়া উত্তম।

তাহিইয়াতুল মাসজিদ আদায়ের তাৎপর্য :

তাহিইয়াতুল মাসজিদ কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর গভীরে রয়েছে চমৎকার কিছু আধ্যাত্মিক ও মানসিক তাৎপর্য।

১. দুনিয়া থেকে আখেরাতে প্রবেশের সেতুবন্ধন : আমরা যখন রাস্তাঘাট, অফিস বা ব্যবসার কাজ শেষে মসজিদে প্রবেশ করি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক দুনিয়ার হাযারো চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে। সরাসরি ফরয ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলে সেই দুনিয়াবি চিন্তাগুলো আমাদের ইবাদতের একাগ্রতা বা খুশূ-খুযূ নষ্ট করে দেয়। তাহিইয়াতুল মাসজিদের এই দুই রাক‘আত ছালাত আমাদের মনকে দুনিয়ার কোলাহল থেকে মুক্ত করে ধীরে ধীরে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার একটি মানসিক প্রস্তুতি হিসাবে কাজ করে।

২. হৃদয়ের পরিশুদ্ধি ও প্রশান্তি : এই দুই রাক‘আত ছালাত এক অদ্ভুত প্রশান্তি বয়ে আনে। যখনই মসজিদে ঢুকে ধীরস্থিরভাবে আপনি তাহিইয়াতুল মসজিদে দাঁড়াবেন, অনুভব করবেন আপনার ভেতরের অস্থিরতাগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে মসজিদে এসে ধপ করে বসে পড়ার চেয়ে দুই রাক‘আত ছালাত পড়ে বসার মধ্যে রয়েছে এমন এক আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্য, যা আপনার পুরো ইবাদতের পরিবেশকেই বদলে দিবে।

৩. আল্লাহর মেহমানদারীর হক আদায় : যখন কেউ কোন সম্মানিত ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করেন, তখন প্রথমেই তাকে সালাম জানান। আর মহান আল্লাহ হ’লেন রাজাধিরাজ। তাঁর ঘরে প্রবেশ করে বসার আগে দুই রাক‘আত ছালাতের মাধ্যমে তাঁকে সম্মান জানানো বান্দার পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ আদব। এই দুই রাক‘আত ছালাত হ’তে পারে আপনার আমার নাজাতের অসীলা। ক্বিয়ামতের দিন যেদিন কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখা ব্যক্তিদের আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন।[৪] তাহিইয়াতুল মাসজিদ সেই সম্পর্কেরই এক উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে থাকে।

কতিপয় বিধান :

আযানের পূর্বে মসজিদে গেলে করণীয় : আযানের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করার মত সময় থাকে তাহ’লে তা আদায় করে বসবেন। তবে সময় না থাকলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন। আযানের পর মাগরিবের পূর্বেও দুই রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. ‘তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক‘আত ছালাত পড়। তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক‘আত ছালাত পড়। অতঃপর তৃতীয় বারে তিনি বললেন, যার ইচ্ছা। যেন লোকেরা এ আমলকে আবশ্যক সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ না করে’।[৫]

খত্বীবের জন্য ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ আদায় করার বিধান : খুৎবার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে খত্বীব মসজিদে প্রবেশ করলে

** প্রিন্সিপাল, জামে‘আ দারুত তাওহীদ, কচুয়া, চাঁদপুর।*

[১] বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪।

[২] বুখারী হা/৯৩১।

[৩] বায়হাক্বী শো‘আব হা/৮৭৭৮; ছহীহাহ হা/৬৪৯।

[৪] বুখারী, হা/১৪২৩, ৬৩০৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১।।

[৫] আহমাদ হা/২০৫৭১; আবুদাঊদ হা/১২৮১।

অবশ্যই ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ দুই রাক‘আত ছালাত পড়ে বসবেন। তবে একেবারে খুৎবার সময়ে পৌঁছলে ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ না পড়েও সরাসরি মিম্বরে ওঠতে পারেন। কেননা জুম‘আর দিন রাসূল (ছাঃ) মসজিদে গিয়েই খুৎবার জন্য সরাসরি মিম্বরে বসতেন।[৬] এ সুযোগ কেবল খত্বীবের জন্য, সাধারণ মুছল্লীদের জন্য নয়।

ওযরবশত ঈদায়নের ছালাত মসজিদে পড়তে হ’লে করণীয় : বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে ঈদায়নের ছালাত মসজিদে আদায় করা হ’লে মসজিদে বসার পূর্বে দুই রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা এটা মসজিদের আদবের সাথে সম্পর্কিত সুন্নাত। ঈদায়নের ছালাতের সাথে সম্পর্কিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وفي رواية فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَّجْلِسَ. ‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করার পূর্বে যেন না বসে’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে নেয়’।[৭] উক্ত বিষয়ে শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, ‘ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করতে হ’লে তার পূর্বে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, যদিও তখন নিষিদ্ধ সময় হয়। তবে ঈদগাহে ঈদের ছালাত আদায় করলে তার পূর্বে ও পরে আর অন্য কোন ছালাত নেই’।[৮] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) একই বক্তব্য প্রদান করেন।[৯]

জুম‘আর খুৎবা চলাকালীন ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ আদায় : তাহিইয়াতুল মাসজিদের গুরুত্ব যে কত বেশী, তা জুম‘আর দিনের একটি ঘটনা থেকে সহজে অনুধাবন করা যায়। ইমামের খুৎবা চলাবস্থায়ও যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তবুও তাকে এই দুই রাক‘আত ছালাত পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ لاَ. قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا. ‘জুম‘আর দিন নবী করীম (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় সুলাইক আল-গাতফানী (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তাহিইয়াতুল মাসজিদ ছালাত না পড়েই বসে পড়লেন। রাসূল (ছাঃ) খুৎবা থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে সুলাইক! তুমি কি দুই রাক‘আত ছালাত পড়েছ? তিনি বললেন, না। নবী কারীম (ছাঃ) বললেন, দাঁড়াও এবং দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করো’।[১০]

উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হ’ল, যেখানে খুৎবা শোনা ওয়াজিব, সেখানে খুৎবা চলাকালীন সময়েও এই ছালাত পড়ার নির্দেশ প্রমাণ করে যে, এটি সাধারণ কোন নফল ছালাতের নির্দেশ নয়; বরং অত্যন্ত মর্যাদামণ্ডিত ও গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। সুতরাং খুৎবার সময় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও সংক্ষিপ্তভাবে দু’রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ ছালাত পড়ে বসবেন’।[১১]

‘ক্বাবলাল জুম‘আ’ বনাম ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ : জুম‘আর দিনে অনেক মসজিদে লক্ষ্য করা যায় যে, মুছল্লীগণ মসজিদে প্রবেশ করে ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ আদায় করেন না। প্রচলিত বয়ানের (বাংলা খুৎবা) পর মূল খুৎবা শুরুর আগে খত্বীব ছাহেব মুছল্লীদেরকে চার রাক‘আত ‘ক্বাবলাল জুম‘আ’ পড়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন, যা বিধিসম্মত নয়। কেননা প্রথমত উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছ ও আছারসমূহ যঈফ ও বাতিল।[১২] দ্বিতীয়ত এটি তাহিইয়াতুল মাসজিদের ছহীহ হাদীছসম্মত আমলকে রদ করে দেয়। এমনকি কোন কোন মসজিদে ‘সুন্নাতের নিয়ত করবেন না’ মর্মে নির্দেশনাও টাঙিয়ে রাখা হয়। আবার কোন কোন মসজিদে সুন্নাতের নিয়ত না করার জন্য লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। যা চরম ঔদ্ধত্য বৈ কিছুই নয়।

নিষিদ্ধ সময়ে ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ আদায়ের বিধান : যেকোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে এই ছালাত পড়তে হয়। এমনকি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ঠিক দ্বি-প্রহরের সময়ও। যখন অন্যান্য ফরয-নফল ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ, তখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’-এর দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা এটি রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদ সংক্রান্ত আদবের সাধারণ নির্দেশনা।[১৩] সুতরাং মসজিদে যেকোন সময় প্রবেশ করলে দুই রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ ছালাত আদায় করতে হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয বা সুন্নাতের সাথে ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ আদায় প্রসঙ্গ : মসজিদে প্রবেশের পর ফরয বা ওয়াক্তিয়া সুন্নাত আদায় করলে পৃথকভাবে ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ পড়ার প্রয়োজন নেই; এর মাধ্যমেই মসজিদের হক আদায় হয়ে যায়। কারণ মূল উদ্দেশ্য হ’ল মসজিদে বসার পূর্বে ছালাত আদায় করা। তবে সময় থাকলে তাহিইয়াতুল মাসজিদ পড়ে নেওয়া যাবে।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকদের বলব, আসুন! আমরা আমাদের হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। আমরা যখনই মসজিদ দেখি, আমাদের হৃদয়ে যেন আল্লাহ্র ভয় ও ভালোবাসা জাগ্রত হয়। মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি বসে না পড়ে আমরা যেন দুই রাক‘আত ছালাতের মাধ্যমে রবের সম্মুখে উপস্থিত হই। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করি, নিতান্ত কোন অপারগতা ছাড়া আমরা আল্লাহ্র ঘরে প্রবেশ করে তাঁর নিকট মাথা নত না করে কখনোই বসবো না। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ঘরের আদব যথাযথভাবে রক্ষা করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

[৬] নববী, আল-মাজমূ‘ ৪/৪০১; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ-দারব ৮/২।

[৭] বুখারী হা/৪৪৪, ১১৬৩; মুসলিম হা/১৬৮৭; মিশকাত হা/৭০৪।

[৮] ইবনু বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/১৫।

[৯] উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ৫/১৫৩।

[১০] মুসলিম হা/৮৭৫; আহমাদ হা/১৪৪৪৫।

[১১] মুসলিম হা/৭২৬৭ (২৮৯২)।

[১২] ইবনু মাজাহ হা/১১২৯; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০১।

[১৩] বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪।

কিছু হারানোয় বা যেকোন বিপদে মুমিনের সান্ত্বনা : এক অনন্যসাধারণ দো'আ

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

মানুষের জীবন আনন্দ ও বেদনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই, যাকে কোন বিপদ বা প্রিয়জন হারানো বেদনার স্বাদ গ্রহণ করতে হয় না। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে কখনো সম্পদ কমিয়ে, কখনো রোগব্যাধি দিয়ে, আবার কখনো প্রিয়জনকে কেড়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন। কিন্তু চরম শোক ও হারানোর এই বেদনাবিধুর মুহূর্তে যেন একজন মুমিন ভেঙে না পড়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তার এক অমোঘ মহৌষধ শিখিয়েছেন প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। দো'আটি হ'ল-

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اَللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي،
وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

উচ্চারণ : *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন; আল্ল-হুম্মা'জুরনী ফী মুছীবাতী, ওয়াখলিফ লী খইরাম মিনহা।*

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আপনি আমাকে প্রতিদান দিন এবং এর বিনিময়ে আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন' *(মুসলিম হা/৯১৮; মিশকাত হা/১৬১৮)*।

দো'আটির মর্মস্পর্শী প্রেক্ষাপট :

ইসলামের ইতিহাসের এক অশ্রুভেজা অথচ পরম প্রাপ্তির উপাখ্যান জড়িয়ে আছে এই দো'আটির প্রেক্ষাপটে। উম্মে সালামা (রাঃ) এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বামী আবূ সালামা (রাঃ) ছিলেন ইসলামের ঊষালগ্নের এক ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ দম্পতি। দ্বীনের প্রদীপে নিজেদের সঁপে দিয়ে তাঁরা জন্মভূমি মক্কার মায়া ত্যাগ করে প্রথমে হাবশা এবং পরে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। একে অপরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, নির্ভরতা ও ভালোবাসাই ছিল তাঁদের এই দীর্ঘ সংগ্রামের পাথেয়।

কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছিল ভিন্ন। ওহোদের প্রান্তরে আবূ সালামা (রাঃ) মারাত্মকভাবে আহত হন। ফলে চতুর্থ হিজরীতে তিনি চিরতরে বিদায় নিলেন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে। প্রিয়তম স্বামীকে হারিয়ে শোকে ও বেদনায় মুহ্যমান উম্মে সালামা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখন কি দো'আ পড়তে পারি। তখন রাসূল (ছাঃ) উক্ত দো'আটি শিখিয়ে দিয়ে বললেন, কোন মুমিন যদি এই দো'আটি পাঠ করে, তবে রাব্বুল 'আলামীন তাকে তার হারানো বস্তুর চেয়েও উত্তম কিছু দান করেন' *(আবূদাঊদ হা/৩১১৫)*।

উম্মে সালামা (রাঃ) দো'আটি পড়লেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ব্যাকুল হৃদয় ভাবছিল 'আমার আবূ সালামার চেয়ে উত্তম মানুষ এই পৃথিবীতে আর কে হ'তে পারে? তিনি যে প্রথম হিজরতকারী, যিনি সব কিছু ছেড়ে আল্লাহ্র রাসূলের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন!' তবুও তিনি তাঁর রবের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে দো'আটি পাঠ করতে থাকলেন।

এরপরের ইতিহাস যেন এক ঐশী অলৌকিকতার গল্প, যা মানুষের ক্ষুদ্র কল্পনারও অতীত। শোকের চাদর সরিয়ে একদিন তাঁর দুয়ারে এসে দাঁড়াল এক অভাবনীয় বার্তা। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন! বিস্ময়ে হতবাক উম্মে সালামা (রাঃ) তখন উপলব্ধি করলেন, পরম করুণাময় আল্লাহ কত নিপুণভাবে তাঁর বান্দার আর্তনাদ শোনেন। কোথায় আবূ সালামা, আর কোথায় দু'জাহানের সরদার! আল্লাহ তাঁর জন্য শ্রেষ্ঠতম মানবকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। তবে তিনি বার্তাবাহক হাতেব বিন আবী বালতা'আ (রাঃ)-কে নিজের কিছু মানবিক দুর্বলতা ও শঙ্কার কথা অকপটে তুলে ধরলেন। বিনীত ভাবে জানালেন, 'আমার তো একটি কন্যাসন্তান রয়েছে, আর আমার স্বভাবের মধ্যে যিদ ও অভিমান বেশী। তার এই সরল স্বীকারোক্তির জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তার কন্যার বিষয়ে আমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করব, যেন আল্লাহ তাকে সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন। আর তার যিদ বা অভিমানী স্বভাবও যেন দূর করে দেন'।

রাসূল (ছাঃ)-এর জবাবে উম্মে সালামা (রাঃ)-এর হৃদয়ের সমস্ত সংশয় নিমিষেই উবে গেল। নিজেকে সঁপে দিলেন এই পবিত্রতম বন্ধনে। এভাবেই চোখের পানির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা উম্মে সালামা (রাঃ)-এর সেই চরম বিপদের মুহূর্তের দো'আ কবুল করেছিলেন। তিনি যে কেবল স্বামী হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবকে পেয়েছিলেন তা-ই নয়; বরং পৃথিবীর বুকে 'উম্মুল মুমিনীন' হওয়ার কালজয়ী মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য : এই দো'আটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে নিখাদ তাওহীদ বিশ্বাস এবং মানসিক প্রশান্তির এক অদ্ভুত শক্তি।

❒ 'আমরা আল্লাহর জন্যই, আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে' এই কথার মাধ্যমে বান্দা স্বীকার করে নেয় যে, আমরা পৃথিবীতে যা কিছু পাই- সম্পদ, সম্পর্ক, প্রিয়জন সবকিছুই আল্লাহ্র দেওয়া আমানত। যা কিছু হারিয়েছি, তার প্রকৃত মালিক আমি নই, আল্লাহ। তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে গেছেন, এতে অভিযোগের কিছু নেই। এই উপলব্ধি হারানোর তীব্র যন্ত্রণাকে প্রশমিত করে এবং হৃদয়কে শান্ত করে।

❒ 'আমাকে প্রতিদান দিন' এই অংশের মাধ্যমে বান্দা নিজের শোককে ইবাদতে পরিণত করে। দুনিয়ার মানুষ বিপদে কেবল কাঁদে, আর মুমিন বিপদে কেঁদেও আখেরাতের ছওয়াব লুফে নেয়। কারণ মুমিন বিশ্বাস করে একটি কাঁটা বিঁধলেও আল্লাহ তার বিনিময়ে গুনাহ মাফ করেন বা মর্যাদা বৃদ্ধি করেন *(বুখারী হা/৫৬৪০)*।

❒ দো'আটির সবচেয়ে সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল শেষের বাক্যটি- 'এর বিনিময়ে আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন'। এই দো'আ আমাদেরকে শেখায় অন্ধকারের পর আলোর স্বপ্ন দেখতে। আল্লাহ যদি একটি দরজা বন্ধ করেন, তবে তিনি আরও সুন্দর ও প্রশস্ত আরেকটি দরজা খুলে দিতে পারেন। এই অগাধ বিশ্বাস হতাশার মেঘ সরিয়ে হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে।

কখন পড়তে হবে?

অনেকেই মনে করেন, এই দো'আটি কেবল কেউ মারা গেলেই পড়তে হয়। এটি একটি ভুল ধারণা। বরং যেকোন ছোট বা বড় বিপদে এটি পড়া যায়। কোন প্রিয়জন মারা গেলে, চাকরী বা ব্যবসায়ে হঠাৎ বড় কোন ক্ষতি হ'লে, মূল্যবান কোন জিনিস হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে, এমনকি সামান্য কোন শারীরিক আঘাত পেলে বা কোন কাজে ব্যর্থ হ'লেও দো'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব।

পরিশেষে বলা যায়, মুমিনের ডিকশনারিতে 'হতাশা' বলে কোন শব্দ নেই। মুমিনের জীবনে হারানো মানেই হ'ল নতুন করে, আরও উত্তমরূপে ফিরে পাওয়ার সূচনা। কোন বিপদে যখন চারদিক অন্ধকার মনে হয়, বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যায়, তখন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ ইয়াক্বীনের সাথে এই দো'আটি পাঠ করুন। বিশ্বাস রাখুন, যে আল্লাহ উম্মু সালামা (রাঃ)-এর ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিয়েছিলেন, সেই আল্লাহ আজও আপনার হারানো বস্তু বা প্রিয়জনের শূন্যস্থান তার চেয়েও উত্তম কিছু দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন।

অনলাইনে নৈতিকতা রক্ষায় করণীয়

*-হাসীবুর রশীদ**

ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার আমাদের জীবনকে অত্যন্ত সহজ করেছে। তবে ইন্টারনেটের প্রসারের সাথে সাথে এর ব্যবহারের নেতিবাচক দিকগুলো ও নৈতিকতার প্রশ্নটিও আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দায়িত্বশীল ব্যবহার না হ'লে এই প্রযুক্তি উপকারের বদলে ঈমান ও আমলের জন্য এক ভয়াবহ ফিৎনায় পরিণত হ'তে পারে, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই ধ্বংস ডেকে আনে। একজন মুমিনের অন্তরে সর্বদা ক্বিয়ামতের মাঠে জবাবদিহিতার অনুভূতি থাকা অপরিহার্য। তাই দুনিয়াবী কল্যাণ লাভ এবং আখেরাতের ক্ষতি থেকে বাঁচতে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব করণীয় ও শিষ্টাচার বজায় রাখা অত্যন্ত যরূরী। এ নিবন্ধে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেসব দিক নিয়েই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ইন্টারনেটে নৈতিকতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা : ইসলামী নৈতিকতা ও তাক্বওয়ার অভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার এক ভয়াবহ ফিৎনা ও বিপজ্জনক হাতিয়ারে পরিণত হ'তে পারে। এর লাগামহীন ও অনৈতিক ব্যবহার সমাজে চরম অবক্ষয়, পাপাচার ও অস্থিরতা তৈরি করে। যা একজন মুমিনের ঈমান ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এছাড়া শরী'আতের সীমারেখা ও নৈতিকতা না মানলে ব্যবহারকারী দুনিয়াবী ক্ষতির পাশাপাশি আখিরাতেও নিজের জন্য চরম ধ্বংস ডেকে আনবে। তাই ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও দ্বীনী শিষ্টাচার রক্ষা করা একান্ত যরূরী। এর ফলে ব্যবহারকারী তাক্বওয়ার ভিত্তিতে দায়িত্বশীল, সচেতন ও নিরাপদভাবে অনলাইনের ইতিবাচক সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারবে।

ইন্টারনেটে নৈতিকতা রক্ষায় করণীয়

ইন্টারনেটের বহুমুখী ফিৎনা থেকে নিজের ঈমান ও আমলকে হেফাযত করে এর সঠিক ও ইতিবাচক ব্যবহারের জন্য একজন মুমিনকে কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। নিম্নে ইন্টারনেট ব্যবহারে ইসলামী নৈতিকতা, তাক্বওয়া ও শিষ্টাচার বজায় রাখার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

১. ইন্টারনেট ব্যবহারের উদ্দেশ্য সৎ রাখা :

ইন্টারনেটে সময় ব্যয় করার মূল উদ্দেশ্য সর্বদা সৎ, ইতিবাচক ও কল্যাণমুখী হ'তে হবে। ইসলামে যেকোন কাজের প্রতিফল সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে নিয়তের উপর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[১] সুতরাং ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষা, গবেষণা, হালাল উপার্জন, দ্বীনী জ্ঞান অর্জন বা প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধানের ন্যায় কল্যাণকর উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যহীন ব্রাউজিং, অপ্রয়োজনীয় আড্ডা, অনৈতিক কনটেন্ট দেখা বা অহেতুক সময় নষ্ট করা হ'তে একজন মুমিনকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে সফল মুমিনদের অন্যতম প্রধান গুণ হিসাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা অনর্থক কাজ হ'তে বিরত থাকে' *(মুমিনূন ২৩/৩)*। তাই ইন্টারনেট ব্যবহারের শুরুতেই নিজের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া আবশ্যক। যাতে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সময়টুকুও ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়।

২. সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা : সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করা একজন মুমিনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ইন্টারনেটে অহেতুক দীর্ঘ সময় ব্যয় করা ব্যক্তির ইবাদত, পড়াশোনা, হালাল রুযী অন্বেষণ বা বিশ্রামের সময় কমিয়ে দেয় এবং চরম মানসিক চাপ তৈরি করে। তাই দৈনন্দিন সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা করে ইন্টারনেট ব্যবহার করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে এরশাদ করেছেন, 'দু'টি নে'মতের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে পতিত হয়। আর তাহ'ল সুস্থতা ও অবসর'।[২]

উদাহরণস্বরূপ, প্রতিদিন কেবল নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য অনলাইনে থাকা এবং এর বাইরে অফলাইনে সময় দেওয়া একটি উত্তম অভ্যাস। প্রয়োজনে বিভিন্ন অ্যাপ বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে 'স্ক্রিন টাইম' নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সময়ের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা আমাদের দৈনন্দিন কাজকেই গতিশীল ও বরকতময় করবে।

অনৈতিক বিষয়াদি এড়িয়ে চলা ও দৃষ্টির হেফাযত করা : অনলাইনে অনেক সময় চরম অশ্লীল, বিভ্রান্তিকর বা মানহানিকর কনটেন্ট সামনে আসে। একজন মুমিনের জন্য এ ধরনের ফিৎনা থেকে দৃষ্টির হেফাযত করা ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর' *(নূর ২৪/৩০)*।

বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Algorithm) এমনভাবে কাজ করে যে, কোন খারাব কনটেন্টে সামান্য সময় ব্যয় করলে পরবর্তীতে টাইমলাইনে বারবার সেটাই ভেসে ওঠে। তাই শয়তানের এই আধুনিক ফাঁদ থেকে বাঁচতে অনৈতিক কনটেন্টগুলো কেবল স্ক্রল করে পার না হয়ে সাথে সাথে ব্লক (Block) বা 'রিপোর্ট' (Report) করা উচিত। এতে পরবর্তীতে ঐ জাতীয় কনটেন্ট আসা বহুলাংশে কমে যায় এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে ইন্টারনেট ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

নেতিবাচক ও মিথ্যা কনটেন্টে লাইক ও শেয়ার না করা : ইন্টারনেট এমন একটি উন্মুক্ত মাধ্যম যেখানে সর্বদা মিথ্যা, গুজব ও অশ্লীল কনটেন্টের ছড়াছড়ি থাকে। অনলাইনে এসব

** শিক্ষার্থী, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।*

[১] *বুখারী হা/১।*

[২] *বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫।*

নেতিবাচক বা ভুয়া কনটেন্টে লাইক ও শেয়ার করার অর্থ হ'ল– পাপের কাজে ও মিথ্যা প্রচারে সহায়তা করা। ইসলামে যাচাই-বাছাই ছাড়া কোন সংবাদ ছড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়'।[৩] এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন নেতিবাচক, হিংসাত্মক বা অশ্লীল পোস্টে সামান্য প্রতিক্রিয়া (React) জানালেও তা মুহূর্তেই অন্যদের কাছে পৌঁছে যায়। এর পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নূর ২৪/১৯)*।

ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় নির্জনতা পরিহার করা : নির্জনতা শয়তানের প্ররোচনার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। দীর্ঘ সময় একা একা বা বদ্ধ ঘরে ইন্টারনেট ব্যবহার করলে অগোচরে পাপাচার ও চারিত্রিক পদস্খলনের মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়। মানুষ লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে যে পাপ করে, তা তার সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাকী অবস্থায় পাপকারীদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন একদল মানুষের পাহাড় সমতুল্য নেক আমলগুলোকে আল্লাহ ধূলিকণায় পরিণত করবেন।... কারণ তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে'।[৪]

মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা লোকদের থেকে লুকাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ থেকে লুকাতে চায় না। তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন রাত্রিতে তারা (আল্লাহ্র) অপ্রিয় বাক্যে শলা-পরামর্শ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মকে বেষ্টন করে আছেন' *(নিসা ৪/১০৮)*। তাই ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় নির্জনতা পরিহার করে সর্বদা পরিবার ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে বা খোলামেলা পরিবেশে তা ব্যবহার করা উত্তম। এতে শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের তাক্বওয়া ও নৈতিকতা রক্ষা করা অত্যন্ত সহজ হয়।

সাইবার বুলিং, ট্রোলিং ও গীবত থেকে বিরত থাকা : বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় কাউকে নিয়ে ট্রোল করা, মিম (Meme) বানিয়ে উপহাস করা বা কমেন্ট বক্সে গীবত করা মহামারির আকার ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে ছোট-বড়, আলেম-ওলামা রাষ্ট্রের সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও ছাড় পাচ্ছেন না। অনেক সময় মানুষ মজা করার ছলেও অন্যের সম্মানহানি করে, যা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এবিষয়ে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা করো না এবং পরস্পরকে মন্দ লকবে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হ'ল ফাসেকী কাজ। যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। সুতরাং ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় একজন মুমিনকে অবশ্যই অন্যের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি যত্নবান হ'তে হবে এবং সাইবার বুলিং বা গীবতের মতো জঘন্য পাপ থেকে নিজের যবান ও কিবোর্ডকে হেফাযত করতে হবে।

অনলাইন প্রতারণা ও হারাম উপার্জন হ'তে বেঁচে থাকা : বর্তমানে ইন্টারনেটে উপার্জনের বহুমুখী সুযোগ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি অনলাইন জুয়া (বেটিং অ্যাপ), ভুয়া ই-কমার্স, স্ক্যামিং বা ফ্রিল্যান্সিংয়ের নামে নানাবিধ হারাম কাজের ব্যাপক ছড়াছড়ি রয়েছে। অনেক তরুণই সহজে অর্থ উপার্জনের মোহে এসব প্রতারণা ও হারামে জড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মনিটাইজেশন অন করে যে অর্থ উপার্জন করা হয় তা এড প্রদর্শনের দ্বারা হওয়ায় উক্ত অর্থ হালাল নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম উপার্জনকারীকে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে'।[৫] সুতরাং ইন্টারনেট বা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে উপার্জনের ক্ষেত্রে উক্ত পেশা বা মাধ্যমটি পূর্ণরূপে শরী'আতসম্মত ও হালাল কি-না, তা গভীরভাবে যাচাই করে নেওয়া একজন মুমিনের জন্য একান্ত যরূরী।

কপিরাইট ও মেধাস্বত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা :

ইন্টারনেটে অন্যের লেখা, ছবি বা কনটেন্ট বিনা অনুমতিতে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া (Plagiarism) কিংবা অবৈধভাবে পেইড সামগ্রী ব্যবহার করা (Piracy) এক ধরনের জঘন্য চুরি। ইসলামে অন্যের অধিকার বা সম্পদ হরণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আধুনিক যুগে মেধাসম্পদও (Intellectual Property) এক প্রকার মূল্যবান সম্পদ। তাই অনলাইনে অন্যের কাজকে নিজের বলে দাবী করা বা অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা স্পষ্ট প্রতারণা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৬] সুতরাং ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যের মেধাস্বত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং প্রয়োজনে মূল সূত্রের উল্লেখ করা একজন মুমিনের নৈতিক দায়িত্ব।

যাচাই ছাড়া তথ্য বিশ্বাস না করা : ইন্টারনেটের অবাধ তথ্যপ্রবাহের এই যুগে সবচেয়ে বড় ফিৎনা হ'ল– ভুয়া খবর ও গুজবের ছড়াছড়ি। অনেকেই অনলাইনে চমকপ্রদ খবর, ছবি বা ভিডিও দেখলেই তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নেন এবং তা প্রচার করেন। অথচ ইসলামে যাচাই-বাছাই ছাড়া কোন সংবাদ বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এবিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সতর্ক করে বলেন, 'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকটে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহ'লে তোমরা সেটা যাচাই কর, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশে কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না কর। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হও' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

ভুয়া কনটেন্ট ও ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন হ'তে সতর্ক থাকা : অনলাইনে গুজবের ফিৎনা হ'তে সমাজ ও নিজের ঈমানকে রক্ষা করতে যেকোন খবরের সত্যতা বিশ্বস্ত উৎস থেকে যাচাই করে নেওয়া একান্ত যরূরী। সন্দেহজনক আইডির

---

[৩] *মুসলিম হা/৫; মিশকাত হা/১৫৬।*
[৪] *ইবনে মাজাহ হা/৪২৪৫; ছহীহাহ হা/৫০৫।*
[৫] *বায়হাক্বী, শু'আব, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯।*
[৬] *মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/২৮৬০।*

পোস্ট ফিৎনামূলক মনে হ'লে সাথে সাথে 'রিপোর্ট' বা 'ব্লক' করতে হবে। এছাড়া, ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া সন্দেহজনক ছবি, ভিডিও বা খবরের সত্যতা উদ্ঘাটনে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ফ্যাক্ট-চেকিং ওয়েবসাইট বা টুলস (যেমন: ফ্যাক্ট চেক, রিউমার স্ক্যানার ইত্যাদি)-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে, অনলাইন বিজ্ঞাপনের (Ads) আড়ালে লুকিয়ে থাকা ক্ষতিকর লিংক, ভুয়া তথ্য বা অশ্লীল কনটেন্ট হ'তে দৃষ্টিকে হিফাযত করতে ব্রাউজারে একটি নির্ভরযোগ্য 'অ্যাড ব্লকার' (Ads Blocker) চালু রাখা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এর মাধ্যমে স্ক্রিনে হঠাৎ অশ্লীল ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন আসার ঝুঁকি কমে।

সাবস্ক্রিপশন গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করা : অনলাইনে বিভিন্ন পরিষেবার সাবস্ক্রিপশন (Subscription) গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা যরূরী। না বুঝে অবৈধ সাবস্ক্রিপশনের ফাঁদে পড়লে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়ে। বিশেষ করে যেসব প্ল্যাটফর্ম অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রসার ঘটায়, সেগুলোর সাবস্ক্রিপশন কেনা মানে পাপাচারে আর্থিক সহায়তা করা। তাই যেকোন সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার পূর্বে পরিসেবার হালাল-হারাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করা, শর্তাবলী পড়া এবং আর্থিক ক্ষতি এড়াতে স্বয়ংক্রিয় নবায়ন (Auto-renewal) বন্ধ রাখা একজন সচেতন মুমিনের কর্তব্য।

ডিজিটাল ওয়েলবিং চালু রাখা : স্মার্টফোন বা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর প্রযুক্তি হ'ল 'ডিজিটাল ওয়েলবিং' । ডিভাইসে এই ফিচারটি চালু রাখলে ব্যবহারকারী নিজের স্ক্রিন টাইম, অ্যাপ ব্যবহারের সময়সীমা এবং নোটিফিকেশন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ডিজিটাল ওয়েলবিং চালু রাখলে দীর্ঘসময় অনলাইনে থাকার আসক্তি ও মানসিক চাপ কমে এবং অপ্রয়োজনীয় কনটেন্ট এড়িয়ে চলা সহজ হয়। ফলে সময়ের অপচয় রোধ করে ইন্টারনেট ব্যবহারে শৃঙ্খলতা, সচেতনতা ও নৈতিকতা বজায় রাখা অনেক সহজতর হয়।

ভিপিএন (VPN) ব্যবহারে সতর্কতা : ভিপিএন (Virtual Private Network) বা ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক মূলত ইন্টারনেটে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ও সাইবার হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই, বিশেষ করে তরুণ সমাজ, সরকার বা ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্লক করে রাখা বিভিন্ন অশ্লীল সাইট, জুয়ার অ্যাপ বা হারাম ওয়েবসাইটগুলোতে প্রবেশ করার জন্য ভিপিএন-এর অপব্যবহার করে থাকে। সুতরাং ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে ভিপিএন-এর ব্যবহার কেবল বৈধ, পেশাগত বা যরূরী নিরাপত্তামূলক কাজেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। গোপন পাপাচার ও দৃষ্টির অবাধ্যতা সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি জানেন তোমাদের চোখের চোরাচাহনি এবং অন্তর সমূহ যা লুকিয়ে রাখে' (মুমিন ৪০/১৯)।

উপসংহার : আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনযাত্রাকে যেমন সহজ ও গতিশীল করেছে, তেমনি মুমিনের ঈমানী অস্তিত্বের জন্য এটি এক চরম পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এমন এক দু'ধারী তলোয়ার, যা দিয়ে যেমন দ্বীন প্রচার ও জ্ঞানার্জনের অবারিত সুযোগ রয়েছে, তেমনি এর অপব্যবহারে ঈমান ও আমল ধ্বংস হওয়ারও সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। একজন সচেতন মুমিন হিসাবে আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, অফলাইন জীবনের মতো আমাদের অনলাইন জীবনেরও প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্লিক, লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার কাঠগড়ায় দিতে হবে। তাই আসুন! ইন্টারনেটকে আমরা কেবল সময় কাটানো, পাপকাজ বা বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ না করে, একে শুধু ভালো কাজের মাধ্যম বানাই। শয়তানের পাতা আধুনিক এই ফিৎনার জাল থেকে নিজেদের চোখ, কান ও অন্তরকে হিফাযত করে তাক্বওয়াভিত্তিক একটি নিরাপদ ও সুস্থ ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইন্টারনেটের যাবতীয় ফিৎনা হ'তে বেঁচে থাকার এবং এর সঠিক ও কল্যাণকর ব্যবহারের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

Khalisun Products
খলিসুন প্রোডাক্টস

বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত

- বিশুদ্ধ মরিচ গুড়া-৫২০ Tk/Kg
- হলুদ গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ধনিয়া গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ভাজা ধনিয়া গুড়া-৫০০ Tk/Kg
- ভাজা জিরা গুড়া-১৫০০ Tk/Kg

- হোম মেড
- পরিষ্কার ও বাছাই করা মরিচ
- হলুদ ধুয়ে শুকিয়ে তৈরি করা
- রং ও কেমিক্যাল মুক্ত
- দেশী মরিচ, হলুদ ও ধনিয়া
- ১০০% খাঁটি ও অথেন্টিক
- ধনিয়া/জিরা ধুয়ে শুকিয়ে ভেজে গুড়া করা
- গরম মসলা গুড়া
- শাহী গরম মসলা গুড়া

বি: দ্র: অর্ডার মোতাবেক তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।

SCAN ME
বিসিক নিবন্ধন নং : RA-20251109-0022719
যোগাযোগ : (ছায়ানীড় আবাসিক এলাকা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৩৩৯-৯৮৬৮৪৮ Khalisun Products

দারুস সুন্নাহ শপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা'লিমী বোর্ড ও কওমী মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, খেজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল, অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুন :

☎ ০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪

অর্ডার করতে ভিজিট করুন : Darus Sunnah Shop

সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ভবন
(নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

আল্লাহ্‌কে ভালোবাসি

-সারওয়ার মিছবাহ

আমি এক ক্ষুদ্র জীব। একটি তেতুল গাছে যেমন লক্ষ লক্ষ পাতা থাকে, যাদের আলাদা আলাদা কোন নাম থাকে না। এই বিশ্ব চরাচরে আমি তেমনই সাধারণ। সেই অযুত পাতার মাঝে কোন পাতাটি শুকিয়ে গেল। ঝরে পড়ল। এটা যেমন কারো খেয়ালে থাকে না। আমিও তেমনই কারো খেয়ালে থাকি না। আমার থাকা বা না থাকায় কারো তেমন কিছু যায় আসে না। আমি এই দুনিয়ায় আসি। হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি। আবার চলে যাই। আমাকে দাফন করার মাত্র দু'ঘণ্টা পরে পরিবারে কান্না কমে আসে।

আমি চলে যাওয়ার তিন ঘণ্টা পরে আমার বাড়িতে আগত মেহমানদের আতিথেয়তা হয়। সবাই নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হয়ত তখন কবরে আমার শরীরে পোকা-মাকড় জমতে শুরু করেছে। এটা মনে করে কেউ মন খারাপ করে না। একদিন পরে তারা বিভিন্ন দেশের খবর, রাজনীতির খবর নিয়ে আলোচনা করে। কবরে তখন আমার শরীর জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কয়েকদিন পরে আমার কর্মক্ষেত্রে আমার জায়গায় নতুন লোক খোঁজা হয়। তখন কবরে আমার শরীর ফুলে গেছে, চামড়া টান টান হয়ে গেছে, গোশতগুলো পঁচে তরল হ'তে শুরু করেছে।

দুই সপ্তাহ পরে আমার পরিবার আমার রেখে যাওয়া সম্পদ ভাগাভাগি করতে বসে। তখন কবরে আমার নখ, দাঁত সব খসতে শুরু করেছে। এটা ভেবে তারা কিন্তু নীরব হয় না। তিনমাস পরে আমার জীবনসঙ্গী আবার আগের মত হাসে। আমার সন্তানেরা হাসে। কবরে তখন আমি কেবল মাটির সাথে মিশে যাচ্ছি। এক বছর পরে কেউ আমার কবর দেখে বলে, 'লোকটাকে এই তো সেদিন কবর দেয়া হ'ল'। অথচ কবরে ততদিনে আমার শরীরের এ্যাসিড আমার কাফনের কাপড়ও নষ্ট করে ফেলেছে। দশ বছর পরে আমার কবরের মাটি সমতল হয়ে যায়। সেখানে আর কবরের চিহ্ন থাকে না। তখন সেখানে আবার নতুন কবর হয়। তারো অনেক নীচে হয়ত আমার দুয়েক টুকরো হাঁড় বাকী থাকে। এভাবেই খুব দ্রুত পৃথিবী পরিবর্তন হয়ে যায়।

আমি জানি, আমি এই দুনিয়ার কেউ না। মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে মনে রাখে না। তবুও কেউ যদি আমাকে বলে, তোমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কি? আমি হয়ত ঠোঁটের কোনে একটু হাসি টানার চেষ্টা করে বলব, ভালোবাসা, আদর, যত্ন। শুধু আমি নই, সবাই হয়ত এটাই বলবে। কারণ, আল্লাহ মানুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবেই ভালোবাসার ক্ষুধা দিয়েছেন। এই ক্ষুধাই আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। ভালোবাসা পাওয়ার জন্য জীবনে কত ভুল দরজায় কড়া নেড়েছি। কত মানুষের কাছে মাথা নত করেছি তার হিসাব নেই। তবুও এই ক্ষেত্রগুলোতেই আমি মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছি। দোষ আমারই ছিল। আমিই বুঝতে পারিনি, আমার মত এই ক্ষুদ্র জীবের ভালোবাসা পেতে ঠিক কোন দরজায় কড়া নাড়তে হয়।

আল্লাহ আমাকে সবকিছু আগেই বলে দিয়েছেন। তার কথা কখনো মন দিয়ে অনুধাবন করিনি। তার কথাগুলো যদি আরো আগে অনুধাবন করতে পারতাম তবে হয়ত কষ্টের দিনগুলোর দৈর্ঘ্য কমে আসত। তিনি তার মহান সত্ত্বাকে ভালোবাসতে বলেছেন। আমি মানুষকে ভালোবেসে জীবন ক্ষয় করার পরে বুঝতে পেরেছি, মানুষকে ভালোবাসতে হয় না। মানুষ ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত নয়। তিনি তাকে খুশি করার চেষ্টা করতে বলেছেন। আমি মানুষকে খুশী করতে গিয়ে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে বুঝেছি, মানুষ খুশী হয় না। তিনি মনের কথা সব তাকে খুলে বলতে বলেছেন। আমি মানুষের কাছে মনের কষ্টের কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, তারা মুখ চেপে চেপে হাসে। আমি চলে যাওয়ার পরে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।

একমাত্র সৌন্দর্যের আধার তো মহান আল্লাহ। যে সৌন্দর্যের দিকে অপলক নেত্রে আমি সত্তর হাযার বছর মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকব। সেই আমি দুনিয়ার আবর্জনার মাঝে সৌন্দর্য খুঁজে বার বার প্রতারিত হয়েছি। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক মির্জা গালিব তো দুনিয়াবী সৌন্দর্যের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে লিখেছিলেন, 'যেদিন আমি ময়ূরকে সাপ খেতে দেখেছি সেদিন থেকেই আমার সৌন্দর্যের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে'। আসলে দুনিয়ার সৌন্দর্যগুলোই এমন। অসুন্দরের খনির ওপরে সৌন্দর্যের প্রলেপ মাত্র। এই মরীচিকায় ঠকতে ঠকতে আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি।

আল্লাহ কুরআনে শিখিয়ে দিয়েছেন, 'বল! আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*। এই বিধান তো আল্লাহ দিয়েছেন আমাকে দুনিয়ার কষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্য। এদিকে আমি আল্লাহ্‌র জন্য শুধু ছালাত আর কুরবানী করেই নিজেকে পরিপূর্ণ মুমিন ভাবি। আমার জীবন-মরণ আল্লাহ্‌র জন্য নয়। ধোঁকার এই দুনিয়ায় জীবন-মরণ আল্লাহ্‌কে সঁপে না দিয়ে যে আমি কত বড় ভুল করেছি, নিজের ওপর কত যুলুম করেছি, আজ সেই কথাই বলব। কেন দুনিয়ার সকল ভালোবাসা থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহকে ভালোবাসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটাই আজ বলব।

জীবনে চলার পথে ছোট ছোট আঘাত বুকের বাম পাঁজরে জমা হয়। টুকরো টুকরো আঘাতগুলো জমে যখন কালো মেঘে রূপ নেয় তখন আমাদের প্রয়োজন হয় একটি শুষ্ক যমীনের। যেখানে বাদলের মত বৃষ্টিপাত করে মনের আকাশ পরিষ্কার হয়। আমি তো নিজে নিজেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারি না বলে অন্যকে ভালোবাসি। তবে সেই ভালোবাসার বিনিময়ে আমরা কেউই শুষ্ক যমীন পাই না। যেখানে সব বলা যায়। কেউই আমাদেরকে আমাদের মত করে বোঝে না।

তবে সেদিন আমার হৃদয়টা হালকা হয়েছে যেদিন আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দু'হাত তুলে কেঁদে কেঁদে সব বলেছি। দেখেছি, সেখানে সবই বলা যায়। যেখানে বলতে কোন সংকোচবোধ হয় না। সত্যি, আমার মনের গহীনে না বলা একটি অক্ষরও বাকী রাখিনি। আমি সেখানে কেঁদে যে প্রশান্তি পেয়েছি, তা এই দুনিয়ার সকল শান্তির উপরে। মনের আকাশে মেঘ জমলে এখন বৃষ্টিপাতের একটি জায়গা আমি পেয়েছি। সেখানে কত যে প্রশান্তি! আমি তো ছিলাম সেই ডাকবাক্সের মত। যার কাছে প্রতিদিন অজস্র চিঠি আসে। তবে ডাকবাক্সের কোন নিজের চিঠি আসে না। যখন আমি আল্লাহকে ভালোবাসলাম তখন আমার কাছে চিঠি স্বরূপ কুরআন এল। সেখানে যে কত কথা! সবই আল্লাহ আমাকে বলেছেন। ভাবতেই অবাক লাগে!

জাফর গোরাখপুরী লিখেছেন, 'শুধু দূর থেকে নয়, কাছ থেকেও ভাল মনে হবে এই শহরে এমন কেউ কি নেই'? সত্যি, আমি মানুষকে শুধু দূর থেকেই ভাল পেয়েছি। কাছে গেলেই যেন তার অজস্র ত্রুটি দেখা যায়। ভালোবাসা কমে যায়। তবে আল্লাহকে ভালোবেসে দেখলাম, ভালোবাসা যত গভীর, মুগ্ধতা ততই বেশী। তাকে যত বেশী জানা যায় ততই ভালোবাসা বাড়ে। আল্লাহ্‌কে

ভালোবাসতে পারার একটি বড় প্রাপ্তি হ'ল, এই দুনিয়ার কারো ওপরে আমার কোন মান-অভিমান, চাওয়া-পাওয়া থাকবে না। কারণ, আমি জানি, আমার যত অভাব, যত প্রাপ্তি সব তার পক্ষ থেকেই আসে। সত্যি, একমাত্র আল্লাহ্কে ভালোবাসার মাধ্যমেই মানুষ ইহ-পরকালে শান্তির দেখা পেতে পারে।

এমনিতেও একজন সাধারণ মুসলমান হিসাবে আমি চাই, আমার ইবাদত ভাল লাগুক। ছালাত ভাল লাগুক, যিকির আমার আত্মাকে প্রশান্ত করুক। তবে এই ন্যূনতম জিনিসটুকুও আমি অর্জন করতে পারি না। কেমন হ'ত, যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসার মাধ্যমে ইবাদত 'ভাল লাগা'র স্তর পার করে মাদকতার স্তরে চলে যেত! ইবাদতে কি মাদকতা আসে না? আসে তো। প্রখ্যাত তাবেঈ উরওয়াহ বিন যুবাইর (রহঃ)-এর পায়ে একবার 'আকিলা' (পচনশীল রোগ) রোগ হয়। চিকিৎসকরা পা কেটে ফেলার পরামর্শ দেন, অন্যথায় পচন পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। পা কাটার সময় তাকে চেতনানাশক কিছু পান করার প্রস্তাব দেওয়া হ'লে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বললেন, 'আমি যখন ছালাতে দাঁড়াবো, তখন তোমরা আমার পা কেটে ফেলো।' এরপর তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র স্মরণে এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেলেন যে, চিকিৎসকরা করাত দিয়ে তাঁর পা কেটে ফেলার পরও তিনি ছালাত ছাড়েননি বা কোন যন্ত্রণার আর্তনাদ করেননি।[১] এটা কি মাদকতা নয়? ছালাতে যদি আমার আসক্তি না হয় তবে আমি কিভাবে সারা রাত ছালাতে দাঁড়িয়ে থাকব? সালাফগণ এই ভালোবাসার আমেজেই সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতেন।

দুনিয়াতে যেমন প্রেমাস্পদের জন্য অপেক্ষা করতে ভাল লাগে, আত্মত্যাগ করতে ভাল লাগে, তেমনই আল্লাহ্র প্রেমেও আত্মত্যাগ রয়েছে। আল্লাহ্র প্রেমেও বিক্রি হওয়া যায়। তাহ'লে আমি আল্লাহ্র ডাকে সাড়া না দিয়ে মানুষের জন্য উজাড় হব কেন? যারা আমাকে কয়েকদিনেই ভুলে যাবে তাদের খুশী করার জন্য দুনিয়ায় বাঁচব কেন? আমার নফস বড়ই অবুঝ। সে যদি বুঝত, তার মৃত্যুর পরে মানুষ কত তাড়াতাড়ি তার কথা ভুলে যাবে তবে কখনোই সে মানুষকে খুশী করার জন্য জীবনযাপন করত না। তার কাছে এই হাসি-কান্না, ভাললাগা-ভালোবাসা সবই অসার মনে হ'ত।

ছুহাইব রূমী (রাঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন মক্কার কাফেররা তার পথরোধ করে। তারা বলে, 'তুমি আমাদের এখানে নিঃস্ব অবস্থায় এসেছিলে, আর এখন সম্পদশালী হয়েছ। তুমি এই সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না।' ছুহাইব (রাঃ) তখন নির্দ্বিধায় বললেন, 'যদি আমি আমার সব সম্পদ তোমাদের দিয়ে দেই, তবে কি তোমরা আমার পথ ছেড়ে দেবে?' তারা রাজী হ'ল। তিনি তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় তাদের হাতে তুলে দিয়ে এক কাপড়ে হিজরত করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, 'আবু ইয়াহইয়া (ছুহাইব) লাভজনক ব্যবসা করেছে! আবু ইয়াহইয়া লাভজনক ব্যবসা করেছে!' তার এই কাজের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন : 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজেকে বিক্রি করে দেয়...' *(বাক্বারাহ ২/২০৭)*।[২] আমিও যদি এভাবে নিজেকে বিক্রি করে দিতে পারতাম! জীবনে আল্লাহ্র কাছে যদি দুয়েকবার আপদামস্তক বিক্রি হ'তে না পারি তবে হাশরের ময়দানে তার সামনে কী নিয়ে দাঁড়াব!

বিখ্যাত ছাহাবী আবু ত্বালহা (রাঃ) ছিলেন মদীনায় আনছারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খেজুর বাগানের মালিক। মসজিদে নববীর ঠিক সামনেই তাঁর 'বাইরুহা' নামক একটি চমৎকার বাগান ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে মিষ্টি পানি পান করতেন। যখন কুরআন মাজীদের এই আয়াত নাযিল হ'ল যে, 'তোমরা কখনোই পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। তখন আবু ত্বালহা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ছুটে গেলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেছেন, আর আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হ'ল 'বাইরুহা' বাগানটি। আমি এটি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় ছাদাক্বা করে দিলাম।[৩]

আমাদের সালাফগণ যুগে যুগে এভাবেই আল্লাহ্কে ভালোবেসে ইসলামকে তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তর করেছেন। অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট প্রিয়তর হব তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে'।[৪] এই হাদীছ পড়ার পর থেকে মনে হ'ত, ভালোবাসাটাই মুখ্য না-কি অনুসরণ। কেউ শুধু ভালোবাসল তবে সুন্নাহ ধারণ করল না, আবার আরেকজন সুন্নাহ ধারণ করল তবে ভালোবাসল না। কে মুমিন হবে?

অনেকদিন পরে বুঝলাম, আমি আসলে ভালোবাসাই বুঝিনি। যাকে ভালোবাসা হয়, অজান্তেই আমরা তার অনুসরণ করে বসি। তার অনুসরণের মাঝে যত বেশী কষ্ট, তত বেশী স্বাদ। যত বেশী কুরবানী, তত ভালোলাগা। একমাত্র ভালোবাসার জন্যই মানুষ হাসিমুখে জান-মাল কুরবানী করতে পারে। রাবী ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, আল্লাহকে ভালোবাসার অন্যতম প্রধান নিদর্শন হ'ল বেশী বেশী তার স্মরণ (যিকির) করা। কেননা তুমি যখনই কোন কিছুকে ভালোবাসবে, তখনই তুমি তার স্মরণ বেশী করবে।[৫]

প্রকৃতভাবে আল্লাহকে ভালোবাসলে গুনাহ কমে যাবে। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে যাবে। আখেরাতের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। যেমন ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন, যদি বান্দারা মহান আল্লাহ্র ভালোবাসার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারত, তবে তাদের পানাহার, জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ এবং দুনিয়ার প্রতি মোহ অনেক কমে যেত।[৬] যখন দুনিয়ার প্রতি মোহ কমবে তখন হারাম থেকে বেঁচে থাকা যাবে। ইবাদতে স্বাদ পাওয়া যাবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হ'ল, জীবনে হতাশা-দুঃখ বলতে আর কিছুই বাকী থাকবে না। সুখে-দুঃখে প্রসন্ন চিত্তে বলা যাবে, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্যই। আমরা তাঁরই জন্য এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল।

---

১. হাফেয আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/৪৩০; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুস ছাফওয়া ২/৮৫।

২. মুস্তাদরাকে হাকেম ৩/৩৯৮-৩৯৯, ইমাম যাহাবী একে ছহীহ বলেছেন। তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা বাকারার ২০৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

৩. ছহীহ বুখারী হা/১৪৬১, মুসলিম হা/৯৯৮।

৪. ছহীহ বুখারী হা/১৫, মুসলিম হা/৪৪।

৫. ইবনে রজব হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ২/৪১০।

৬. আবু নু'আইম ইসফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ৭/২৯।

সূচীপত্র

স্বদেশ

দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন বাংলাদেশ

ইউনেস্কোর সর্বশেষ বিশ্ব শিক্ষা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ন্যূনতম দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের হারে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরে গড়ে মাত্র ৫৫ শতাংশ শিক্ষক নির্ধারিত দক্ষতার মান পূরণ করতে পেরেছেন। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে এই হার ৫৪.৭ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৫৫.২ শতাংশ। একই সূচকে মালদ্বীপ ৯৮.৫ শতাংশ দক্ষ শিক্ষকের হার নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে এবং ভুটান, নেপাল, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানও বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০২৪ সালের তথ্যে দেখা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী পড়ানো শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ১৬.৯৯ শতাংশের ইংরেজীতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে এবং গণিতের ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ১৪.৬৬ শতাংশ। এই পরিসংখ্যানগুলো বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার চরম ঘাটতি ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

পারমাণবিক যুগে বাংলাদেশ : রূপপুরে জ্বালানি লোডিং শুরু

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত ২৮শে এপ্রিল পাবনা যেলার ঈশ্বরদীতে নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে জ্বালানি লোডিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বের ৩৩তম পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে প্রয়োজনীয় কারিগরী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে আগামী ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রথম ইউনিট থেকে বাণিজ্যিকভাবে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হ'তে পারে। এখান থেকে মোট ২,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে টানা ৬০ বছর নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা দেশের মোট চাহিদার প্রায় ১০ থেকে ১২ শতাংশ পূরণ করবে। তবে প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সাপেক্ষে আরো ৩০ বছর পর্যন্ত কেন্দ্রটির আয়ু বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এখানে নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং রাশিয়ার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানীর তুলনায় কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই সক্ষমতা দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়ন ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

জরিমানার টাকায় শিশুর জন্য হেলমেট কিনিয়ে দিলেন পুলিশ

সাধারণত রাস্তায় মোটরসাইকেল চালকদের ট্রাফিক আইনের ব্যত্যয় ঘটলে মামলা ও জরিমানার মুখোমুখি হতে হয়। তবে গত ২৪শে এপ্রিল শুক্রবার রাজধানীর মগবাজার এলাকায় দেখা যায় এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য। সেদিন এক ব্যক্তি তার শিশুকে হেলমেট ছাড়াই মোটরসাইকেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য রাজিব তাকে থামিয়ে প্রচলিত আইন অনুযায়ী দুই হাযার টাকা জরিমানা করার সুযোগ থাকলেও তা না করে বরং মানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে জরিমানার টাকা দিয়ে পাশের দোকান থেকে শিশুর নিরাপত্তার জন্য একটি মানসম্মত হেলমেট কিনে আনতে বলেন। পুলিশের এমন দায়িত্বশীল ও জনবান্ধব উদ্যোগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, কেবল আইন প্রয়োগ নয় বরং জীবনের নিরাপত্তাকে এভাবে গুরুত্ব দিলে সাধারণ মানুষের মাঝে ট্রাফিক আইন মানার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

অতিরিক্ত লবণ-চিনি ও চর্বিযুক্ত খাবারে বাড়ছে অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি

অতিরিক্ত লবণ, চিনি ও চর্বিযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারের কারণে দেশে স্থূলতা, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের মতো অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি মারাত্মকভাবে বাড়ছে। যার ফলে বছরে প্রায় ৫ লাখ ৭০ হাযার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, যা দেশের মোট মৃত্যুর প্রায় ৭১%। দেশের ৯৭% মানুষ নিয়মিত প্যাকেটজাত খাবার গ্রহণ করলেও এর পেছনের জটিল পুষ্টি তথ্য বুঝতে পারেন না বলে স্বাস্থ্যকর খাবার নির্বাচনে প্যাকেটের সম্মুখভাগে স্পষ্ট সতর্কবার্তা বা 'ফ্রন্ট-অব-প্যাকেজ লেবেলিং' (চালু করা এখন সময়ের দাবী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বের ৪৪টি দেশের মতো বাংলাদেশেও এই লেবেলিং ব্যবস্থা কার্যকর হ'লে অসংক্রামক রোগের প্রকোপ হ্রাসের পাশাপাশি চিকিৎসা ব্যয় অনেকাংশে কমে আসবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন-বিএমএ ভবনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশে ফ্রন্ট-অফ-প্যাকেজ লেবেলিং (এফওপিএল): প্রয়োজনীয়তা, অগ্রগতি ও করণীয়' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় এসব মতামত তুলে ধরেন বক্তারা।

[মানুষের কর্মহীন জীবন তার স্বাস্থ্যহানির জন্য প্রধানত দায়ী। এযুগের সবকিছু সহজলভ্য হওয়ায় অধিকাংশ মানুষের কষ্টের কাজ কমে গেছে। তাছাড়া মানুষের মধ্যে ব্যায়ামের অভ্যাস নেই বললেও চলে। দেহকে কষ্ট দিলে এবং ঘাম ঝরলে মেদ কমে যাবে। 'ক্ষুধা না হলে খাব না' এই নীতি বজায় রাখতে হবে। 'পেটের এক ভাগ খাদ্য দিয়ে পূরণ কর, একভাগ পানি দিয়ে, বাকী এক ভাগ খালি রাখ' এই হাদীছটি মেনে চলতে হবে। সর্বোপরি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখলে শরীর সুস্থ থাকবে ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

বিদেশ

ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শহর মেক্সিকো

উত্তর আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ মহানগর মেক্সিকো সিটি ভয়াবহ ভূ-ধস বা 'ল্যান্ড সাবসিডেন্স'-এর মুখে পড়েছে। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ও ইসরো যৌথভাবে পরিচালিত 'নিসার' (NISAR) স্যাটেলাইটের নতুন রাডার চিত্রে দেখা গেছে, শহরটির কিছু অংশ প্রতি মাসে আধা ইঞ্চিরও বেশী নিচে দেবে যাচ্ছে। বর্তমানে এটি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ডুবে যাওয়া রাজধানীগুলোর একটি। এই সংকটের মূল কারণ অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন। ২ কোটি ২০ লাখ মানুষের শহরটির প্রায় ৬০ শতাংশ পানির চাহিদা পূরণ হয় ভূগর্ভস্থ জলাধার থেকে। দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত পানি তোলার কারণে নিচের জলাধার ফাঁপা হয়ে পড়ছে এবং উপরের নরম কাদামাটির স্তর সংকুচিত হয়ে প্রতি বছর প্রায় ১০ ইঞ্চি হারে নিচে দেবে যাচ্ছে। এর ফলে শহরের রাস্তাঘাট, মেট্রোরেল ও ঘরবাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে, দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে লাগামহীন নগরায়িত শহরটি অচিরেই স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং একসময় 'ডে জিরো' বা কল থেকে পানি আসাও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

[এ সমস্যা প্রায় সব দেশেই দেখা দিচ্ছে। মানুষ যত বেশী ভূগর্ভস্থ পানির

উপর নির্ভরশীল হবে, ততবেশী ভূপৃষ্ঠ নীচে নেমে যাবে। অতএব পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের যথার্থ ভূমিকা রাখা আবশ্যক (স.স.)]

আবারো ঘুষ ও দুর্নীতির দায়ে চীনের দুই সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড

চীনের সামরিক বাহিনীতে দুর্নীতি ও আনুগত্যহীনতা নির্মূল করতে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের চলমান শুদ্ধি অভিযানের অংশ হিসাবে সাবেক দুই প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ওয়েই ফেংহে এবং জেনারেল লি শাংফুকে দুই বছরের স্থগিতাদেশসহ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে দেশটির একটি সামরিক আদালত। গত ৭ই মে ঘোষিত এক রায়ে জানানো হয়, দুই বছর কারাগারে সন্তোষজনক আচরণ করলে এই সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত হতে পারে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা সিএসআইএস (CSIS)-এর তথ্যমতে এই অভিযানে এখন পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বরখাস্ত বা নিখোঁজ হয়েছেন। যার মধ্যে এই দুই জেনারেলই এ পর্যন্ত দণ্ডিত হওয়া সর্বোচ্চ পদমর্যাদার সামরিক কর্মকর্তা। উল্লেখ্য ২০২৫ সালে ঘুষ গ্রহণের দায়ে চীনের সাবেক কৃষিমন্ত্রী তাং রেনজিয়ানকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল দেশটির একটি আদালত।

মুসলিম জাহান

বিশ্বমঞ্চে তুরস্কের নতুন সামরিক শক্তি : শব্দের চেয়ে ২৫ গুণ দ্রুতগামী ক্ষেপণাস্ত্র

গত ৫ই মে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে আয়োজিত 'সাহা ২০২৬' প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে প্রথমবারের মতো উন্মোচন করা হয়েছে দেশটির নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 'ইলদিরিমহান'। তুরস্কের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরঅ্যাণ্ডডি সেন্টারের তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রায় ৬ হাযার কিলোমিটার পাল্লায় আঘাত হানতে সক্ষম এবং শব্দের চেয়ে ২৫ গুণ বেশী গতিতে ছুটতে পারে। এটি এখন পর্যন্ত তুরস্কের তৈরি সবচেয়ে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র প্লাটফর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম। চারটি শক্তিশালী রকেট ইঞ্জিন ও লিকুইড নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড জ্বালানী সমৃদ্ধ এই উদ্ভাবনটি প্রতিরক্ষা শিল্পে তুরস্কের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতারই এক অনন্য প্রতিফলন।

মধ্যপ্রাচ্যে আকাশ প্রতিরক্ষায় নতুন মেরুকরণ : সঊদী-তুরস্কের যুদ্ধবিমান প্রকল্প

তুরস্ক এবং সঊদী আরব যৌথ উদ্যোগে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান 'কান' তৈরির মাধ্যমে নিজেদের বিমানবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক আকাশ প্রতিরক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হ'ল যুদ্ধবিমান সংগ্রহে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা কমানো এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রাঈলের বিমানবাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করা।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ক্রয়ের প্রাথমিক চুক্তি থাকলেও, ইস্রাঈলের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার স্বার্থে আরোপিত বিভিন্ন মার্কিন বিধিনিষেধের কারণে রিয়াদ বিকল্প প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের কৌশলগত অবস্থানের পরিবর্তন এবং সাম্প্রতিক সংঘাতগুলোতে মার্কিন প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও আস্থার সংকট তৈরি করেছে। ফলে তারা এখন তুরস্ক, পাকিস্তান, চীন বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো বিকল্প দেশ থেকে কম শর্তে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠছে। তবে তুরস্কের এই নির্মাণ কাজে সঊদী আরবের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং এই বিমান ক্রয়ে দেশটির আগ্রহের খবরে ওয়াশিংটনে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, তুরস্কের এই যুদ্ধবিমান প্রকল্পে রিয়াদের অর্থায়ন ও অংশগ্রহণ সঊদী আরবের নিজস্ব সামরিক শিল্পকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি তুরস্কের উন্নত প্রযুক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। এর মাধ্যমে আগামী দিনে সঊদী আরব, তুরস্ক, পাকিস্তান এবং সম্ভবত মিসরকে নিয়ে একটি নতুন আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বাতাস থেকে তৈরি হবে জ্বালানি!

মাটির নিচে থাকা তেলের খনির উপর নির্ভর নয়, আমাদের চারপাশে থাকা বাতাস থেকেই এবার তৈরি হবে জ্বালানি। শুনতে অবাক লাগলেও বৈপ্লবিক এই ভাবনা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কাজ করছে জাপানের জ্বালানি প্রতিষ্ঠান এনিওস কর্পোরেশন। ইতিমধ্যে নিজেদের ইয়োকোহামা ডেমোনস্ট্রেশন প্ল্যান্টে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করে 'ইলেক্ট্রোলাইসিস' প্রক্রিয়ায় পানি থেকে হাইড্রোজেন আলাদা করা হচ্ছে এবং বাতাস থেকে সংগৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হচ্ছে তরল হাইড্রোকার্বন (কৃত্রিম ডিজেল বা জেট ফুয়েল)। এই জ্বালানি প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানির মতোই শক্তিশালী এবং বর্তমান ইঞ্জিন বা অবকাঠামো পরিবর্তন ছাড়াই সরাসরি ব্যবহারযোগ্য। যদিও এই উদ্ভাবন জ্বালানি সংকটের টেকসই সমাধান হিসাবে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, তবে উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় একে বাণিজ্যিক বা শিল্প পর্যায়ে পৌঁছে দিতে আরও সময়ের প্রয়োজন হবে।

স্বশিক্ষিত সোলেমানের ভ্রাম্যমাণ সৌর সেচযন্ত্রের উদ্ভাবন

জ্বালানী সংকট ও লোডশেডিংয়ের দুশ্চিন্তা দূর করতে ঠাকুরগাঁওয়ের সোলেমান আলী তৈরি করেছেন এক অনন্য ভ্রাম্যমাণ সৌর সেচযন্ত্র, যা কৃষি খাতে আশার আলো দেখাচ্ছে। মাত্র প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করা সোলেমান নিজের কারিগরী দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় ২ হাযার ৫০০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই সৌর প্যানেল ও পাম্পের কাঠামোটি উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ৩ হর্সপাওয়ারের পানির পাম্প চালিয়ে দিনে প্রায় ১০ একর জমিতে অনায়াসেই সেচ দেওয়া সম্ভব। চাকাযুক্ত হওয়ায় যন্ত্রটি সহজেই এক জমি থেকে অন্য জমিতে স্থানান্তর করা যায়। এর ফলে সেচ খরচ বিঘাপ্রতি ৭-৮ হাযার টাকা থেকে কমে মাত্র ৩ হাযার টাকায় নেমে এসেছে। এ পর্যন্ত তিনি শতাধিক সৌর সেচযন্ত্র তৈরি করে বিক্রি করেছেন। পাশাপাশি ছয়টি সেচযন্ত্র নিজে ব্যবহার করছেন এবং ভাড়ায় খাটছে আরও ২০টি সেচযন্ত্র। সোলেমান কেবল কৃষিতেই নয়, বরং নিজের বাড়ীর ফ্রিজ, এসি এবং খামারের ভারী যন্ত্রপাতিও সৌরশক্তিতে চালিয়ে মাসিক বিদ্যুৎ বিল ২০-২৫ হাযার টাকা থেকে কমিয়ে এক হাযার টাকার নিচে নামিয়ে এনেছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মতে, তৃণমূল পর্যায়ে সোলেমানের এই টেকসই উদ্ভাবন ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের ওপর চাপ কমার পাশাপাশি কৃষিকাজে সেচের খরচ বহুগুণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

[সরকারীভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে এদেরকে উৎসাহিত করা উচিত। যাতে ভবিষ্যতে আরো বিজ্ঞানী সৃষ্টি হয় (স.স.)]

সূচীপত্র

কবিতা

জামা‘আতবদ্ধ জীবন

-আবূ রায়হান, নাটোর।

এক হয়ে চল, এক হয়ে বল, এক কাতারের বীর,
জামা‘আত বেঁধে তুলে ধরো আসমানে ঐ শির!
ছিন্ন-ভিন্ন থেকো না আর, ভেদাভেদ ভুলে যাও,
এক রজ্জুকে শক্ত করে দু’হাতে আঁকড়ে নাও।
একা একা তুমি দুর্বল অতি, ঝড়ে নিভে যাবে বাতি,
জামা‘আত হ’ল আঁধারের বুকে লক্ষ তারার সাথী।
বিন্দু বিন্দু সলিল মিলেই মহাসাগর জানি হয়,
একতাবদ্ধ মুমিন কখনো মানে না তো পরাজয়!
কাঁধে কাঁধ মেলাও, পায়ে পা মেলাও, এক হয়ে দাঁড়াও ভাই,
জামা‘আত গড়া ফরয বিধান, বিকল্প কোন নাই!
ভেঙে ফেল আজ ভেদাভেদের ঐ প্রাচীর-সীমানা যত,
জামা‘আত-ভুক্ত হৃদয়ে জাগুক দীপ্ত শপথ শত।
বিচ্ছিন্ন যে, শয়তানের সে খোরাক হবেই জানি,
রাসূলের এই অমিয় বচন, শাশ্বত মহাবাণী।
হাতে হাত রাখো, বুকে বুক বাঁধো, ভয়কে করো লয়,
জামা‘আতবদ্ধ জীবনেই আসে নিশ্চিত মহাজয়!

শান্তির ধন

-আব্দুর রহমান, নওগাঁ।

ভোরের আযানে ভেঙে যায় ঘুমঘোর,
পূর্বের আকাশে রাঙা হয় ভোর।
স্নিগ্ধ হাওয়ায় দুলে ওঠে তরুলতা,
পাতায় ফুলে জেগে ওঠে সজিবতা।
মক্তবে যায় যত গাঁয়ের ছেলেরা,
কুরআনের আলোতে মন হয় ঘেরা।
আয়াতে আয়াতে ওঠে মধুর সে সুর,
মুছে দেয় সব ব্যথা, করে দেয় দূর।
মাঠভরা ধানগুলো হাওয়াতে দোলে,
কৃষকের মন যেন আনন্দে ভোলে।
রহমান মহীয়ান আল্লাহ মহান,
তাঁরই দয়াতে বাঁচি মোরা সব প্রাণ।
গাঁয়ের পাশ ধরে বয়ে যায় নদী,
রহমত ঝরে যেন সদা নিরবধি।
সূর্য ডোবে গাঁয়ে নদীর ওপারে,
আযানের ধ্বনি যেন ভাসে বারেবারে।
মসজিদে ছুটে যায় গাঁয়ের সব লোক,
ভাগ করে নেয় সব সুখ কিবা শোক।
মায়া মমতায় ঘেরা মোর এই গ্রাম,
সবার ঠোঁটেতে সদা আল্লাহ্‌র নাম।
ঈমানী আলোয় সব উজ্জ্বল মন,
গ্রামটা যেন মোদের শান্তির ধন।

চলে গেলেন প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী (রহ.)

‘আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম বাংলাদেশ’-এর আমীর মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী (৮০) গত ২৭শে মার্চ শুক্রবার ভোর ৫-টায় তার নিজ বাসভবন সিলেট যেলার কানাইঘাট থানাধীন বাঁশবাড়ী গ্রামে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন দুপুর ২-টায় তার নিজগ্রামের তাহেরিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদ্রাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার কনিষ্ঠ পুত্র সঊদী আরবের কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত হাফেয মুহাম্মাদ সালমান। জানাযা শেষে তাকে সামাজিক গোরস্থানে দাফন করা। জানাযায় বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বশীল, কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৭৮-৮০ সালে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ্ম-আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি ২০০৬ সালের ২রা জুন শুক্রবার আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের মুক্তির দাবিতে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে আয়োজিত মহাসমাবেশে বক্তৃতা করেন। ১৯৮৩ সালে ‘আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম’ প্রতিষ্ঠা হ’লে তিনি তার নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। অতঃপর তিনি ১৯৯৩ সালের ২৪শে মে উক্ত সংগঠনের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। অতঃপর ২০১৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী তিনি তার আমীর নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু উক্ত দায়িত্বে ছিলেন। জামালপুরের সরিষাবাড়ী আরামনগর কামিল মাদ্রাসা থেকে তিনি ১৯৭২ সালে কামিল সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে তিনি মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী সহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে। অতঃপর ১৯৮৬ সালে নারায়ণগঞ্জ যেলার রসূলপুর ওসমান মোল্লা ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন এবং ২০১৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত ও অনূদিত বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দীর্ঘ ৪১ বছর ঢাকার বাংলাদুয়ার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে (২০১৯ সাল পর্যন্ত) খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, গত ২রা মে ২০২৬ শনিবার বংশাল-মালিবাগ পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, ঢাকায় ‘আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম বাংলাদেশ’-এর নব মনোনীত আমীর হিসাবে হাফেয আব্দুস সামাদ মাদানী অভিষিক্ত হন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন ‘বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস’-এর সভাপতি ড. আব্দুল্লাহ ফারূক সালাফী এবং প্রধান আলোচক ছিলেন ‘আহলেহাদীস জামা‘আত’-এর আমীর ড. মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। এছাড়া বিশেষ আলোচকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, বংশাল বড় মসজিদের প্রধান মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন, বায়তুল মা‘মূর জামে মসজিদ নয়াবাজারের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ আব্দুল হাই, আলহাজ্জ ইসমাঈল নওয়াব প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সুধীমণ্ডলী।

সূচীপত্র

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর নীতিমালা

বি.দ্র : একজন প্রতিযোগী নিম্নের ৪টি গ্রুপের মধ্যে যেকোন ১টি গ্রুপে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ক- গ্রুপ

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৫ বা তার পরে এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর পূর্বে হতে হবে)।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত

পরীক্ষা পদ্ধতি : ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে, ১০ নম্বর লিখিত এবং ৩০ নম্বর মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

খ- গ্রুপ

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১১ এর পরে এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর পূর্বে হতে হবে)।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত

পরীক্ষা পদ্ধতি : ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে, ১০ নম্বর লিখিত এবং ৩০ নম্বর মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

গ- গ্রুপ

(কেবল জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ৭ থেকে ১২ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর পরে এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর পূর্বে হতে হবে)।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত

পরীক্ষা পদ্ধতি : ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে, ১০ নম্বর লিখিত এবং ৩০ নম্বর মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ- গ্রুপ

বয়স : ৭ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১১ এর পরে এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর পূর্বে হতে হবে)।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় : জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৮টি জাগরণী ও আক্বীদা) শুধু বালকদের জন্য।

পরীক্ষা পদ্ধতি : জাগরণী মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে, যার মান হবে ৭৫। আক্বীদা ২০ নম্বর এমসিকিউ এবং ৫ নম্বর লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা

(সকল গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১. ৩১শে আগস্টের পূর্বে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০/- (ত্রিশ) টাকা রেজিস্ট্রেশন ফী প্রদান করে অবশ্যই অনলাইনে ফরম পূরণ করতে হবে। ফরম পূরণের সময় জন্মনিবন্ধনে উল্লিখিত নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে। অনলাইনে ফরম পূরণের ঠিকানা : sonamoni.org

২. ফরমে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট অপশন আসবে। সেখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড অপশন দেখাবে। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটি ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং শাখা, উপযেলা, যেলা ও কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাড়া কোন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত টাকা) প্রদান করে এডমিট কার্ড গ্রহণ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. মৌখিক অংশের জন্য ৩ জন করে বিচারক থাকবেন।

৬. প্রতিটি গ্রুপের **বাছাইকৃত তিনজন সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।**

৭. শাখা, উপযেলা ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/ উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও পুরস্কার প্রদান করবেন।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার পর প্রতিটি গ্রুপের পাঁচজন সোনামণিকে নিয়ে উন্মুক্ত মঞ্চে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

৯. সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০. **পুরস্কার :**

(ক) প্রথম পুরস্কার : ১০,০০০/- টাকা ও ক্রেস্ট।
(খ) দ্বিতীয় পুরস্কার : ৮,০০০/- টাকা ও ক্রেস্ট।
(গ) তৃতীয় পুরস্কার : ৬,০০০/- টাকা ও ক্রেস্ট।
ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. **শাখা** : ৪ঠা সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. **উপযেলা** : ১১ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. **যেলা** : ১৮শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. **কেন্দ্রীয় কার্যালয়** : ৮ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, সকাল ৮-টা)।
৫. **চূড়ান্ত পর্ব** : ৮ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, বাদ আছর)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রশিক্ষণ

১০ই এপ্রিল শুক্রবার ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ : অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল থানাধীন ত্রিশাল বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুল হক।

১৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার গাযীপুর-উত্তর : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মণিপুর বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘে’র যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

১৮ই এপ্রিল শনিবার ছাতিহাটি, টাঙ্গাইল : অদ্য বাদ যোহর যেলার কালিহাতি থানাধীন ছাতিহাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন শহর শাখা ‘আন্দোলন’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুযযামান।

২৩শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার পূর্বাচল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন পূর্বাচল মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী মাদ্রাসার হলরুমে যেলা ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘে’র উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ডা. আ. ন. ম. সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন ও প্রচার সম্পাদক আলমগীর হোসাইন।

২৪শে এপ্রিল শুক্রবার বংশাল, ঢাকা-দক্ষিণ : অদ্য বাদ আছর যেলার বংশাল থানাধীন যেলা ‘আন্দোলন’-এর কার্যালয়ে যেলা ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘে’র যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন।

২৫শে এপ্রিল শনিবার পূর্ব বাঞ্চানগর, লক্ষীপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন পূর্ব বাঞ্চানগর তরীকায়ে মুহাম্মাদ (ছা.) জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘে’র যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুছতফা মাহতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘যুবসংঘে’র সভাপতি মুহাম্মাদ তারেক।

৯ই মে শনিবার ফুলবাড়ী, দিনাজপুর-পূর্ব : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার ফুলবাড়ী থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে দায়িত্বশীল ও কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও সোনামণি’ কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইহসান।

সুধী সমাবেশ

২৪শে এপ্রিল শুক্রবার ময়মনসিংহ-দক্ষিণ : অদ্য বাদ জুম‘আ যেলার সদর থানাধীন গোলপুকুরপাড় কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ভবনে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে সদর উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সমাবেশ শেষে এ্যাডভোকেট রেযাউল করীমকে সভাপতি ও আবু ছালেহ সোলায়মান শামীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট সদর উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

একই দিন বাদ আছর যেলার ফুলবাড়িয়া উপযেলাধীন পশ্চিম আন্ধারিয়াপাড়া আহলেহাদীছ মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে ফুলবাড়িয়া উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে সাইফুল ইসলামকে সভাপতি ও মোফাযযল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ফুলবাড়িয়া উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উভয় অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুল হক।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

সুধী সমাবেশ

১৭ই এপ্রিল শুক্রবার মিয়াপুর, চারঘাট, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর যেলার চারঘাট থানাধীন মিয়াপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সারদা এলাকা ‘যুবসংঘে’র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ

ছাকিব, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

মাসিক ইজতেমা

৮ই মে শুক্রবার ঢাকা-দক্ষিণ : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার খিলগাঁও থানাধীন গৌড়নগর ইসলামবাগ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, খিলগাঁও থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহবূবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট মুনীরুযযামান, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি হাফেয আব্দুর রাযযাক, থানা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ কাওছার ও নাছিরাবাদ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব হাফেয ইউসুফ।

আল-আওন

'তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার

৯ই মে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : অদ্য দুপুর ২.৩০ থেকে ৬-টা পর্যন্ত আল-'আওন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর.সি. মজুমদার অডিটোরিয়ামে 'তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আল-'আওন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক মুহাম্মাদ আকরাম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সেমিনারে গবেষণাপত্র পাঠ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাবির এমফিল গবেষক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মাদ হেদায়েত উল্লাহ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল এবং ইসলামী দাঈ ও উদ্যোক্তা আহমাদ আরেফীন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র আব্দুল কাদের।

আলোচকগণ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তরুণ প্রজন্মের আত্মবিকাশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকা নিয়ে গভীর ও তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ অধিবেশনে প্যানেল আলোচনা ও উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উপস্থাপন করেন এবং আলোচকবৃন্দ সেগুলোর উত্তর প্রদান করেন।

মৃত্যু সংবাদ

১. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'আল-আমীন ফাউণ্ডেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা, কানাডা প্রবাসী জনাব রূহুল আমীন (৬৫) গত ২৮শে এপ্রিল সকাল ৬-টায় ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। ঐদিন সকাল ১০টায় মাদারটেক পশ্চিম নদীপাড়া আল-আবরার টাওয়ারের বেজমেন্টে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বাদ আছর নিজ যেলা লক্ষীপুরে ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সাবেক ইমাম আনীসুর রহমান। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় ঢাকা দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, 'আহলেহাদীছ' হওয়ার পর থেকেই তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর একজন একনিষ্ঠ শুভাকাঙ্খী ও সহযোগী হিসাবে কাজ করে গেছেন এবং আমৃত্যু নিজের প্রতিষ্ঠিত 'আল-আমীন ফাউণ্ডেশনে'র মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন।

২. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন বহলতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সভাপতি ইব্রাহীম শিকদার (৯৬) গত ১৪ই এপ্রিল রোজ মঙ্গলবার রাত ৯-টা ২০মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিলা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন* । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্রসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বাদ যোহর বহলতলী হাইস্কুল ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন বহলতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব হাফেয লায়েকুযযামান শিকদার। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী, অর্থ সম্পাদক যায়েদুর রশীদসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

৩. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার সাবেক সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইন (৮০) গত ২৫শে এপ্রিল রোজ শনিবার দুপুর আড়াইটায় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাস ভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বাদ মাগরিব যেলা শহরের বাসাবাটি দড়াটানা ব্রীজের নিচে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। । অতঃপর রাত ৯-টায় তার নিজ গ্রাম যেলার সদর থানাধীন রঘুনাথপুর ঈদগাহ ময়দানে ২য় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা যুবায়ের ঢালী। জানাযা শেষে তাকে সামাজিক গোরস্থানে দাফন করা। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মনোয়ার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক।]

প্রশ্নোত্তর?

ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮
(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : সন্তানের নাম আবুল ক্বাসেম রাখা যাবে কি?

-আসাদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : সন্তানের নাম আবুল ক্বাসেম রাখা যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) তার জীবদ্দশায় এই উপনাম রাখতে নিষেধ করেছিলেন যাতে কেউ এই নামে তার সন্তানকে ডাকলে তিনি বিভ্রান্ত না হন। তার মৃত্যুর পর এই বিধান প্রযোজ্য নয়। সেজন্য দেখা যায় বহু ছাহাবী তাদের সন্তানের নাম আবুল ক্বাসেম রেখেছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ছাহাবীগণ বুঝেছিলেন যে, এই নিষেধাজ্ঞাটি কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমসাময়িক সময়ের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আর এই মতটিই অধিক শক্তিশালী। কারণ কিছু ছাহাবী তাদের সন্তানের নাম 'মুহাম্মাদ' রেখেছিলেন এবং তাদের উপনাম রেখেছিলেন 'আবুল ক্বাসেম'। ইমাম আইয়ায (রহঃ) বলেন, জমহূর সালাফ, পরবর্তী আলেমগণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ফক্বীহগণ এই মতই পোষণ করেছেন *(ফাৎহুল বারী ১০/৫৭৩)*। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আবুল ক্বাসেম কুনিয়াত (উপনাম) গ্রহণ করাতে কোন বাধা নেই। কারণ সঠিক মত হ'ল- এই নিষেধাজ্ঞাটি কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশার জন্য ছিল... তাঁর মৃত্যুর পর এতে আর কোন বাধা নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২৪৭)*।

প্রশ্ন (২/৩২২) : অনেকেই জীবনের চরম ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও অবৈধ পথে বিদেশে যান। জীবিকার জন্য অবৈধ পথে এভাবে বিদেশে যাওয়া যাবে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : নিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে বা বিদেশে কোথাও ভ্রমণ করা যাবে না। কারণ এটা আত্মহননের শামিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুমিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানের মুখে ঠেলে দেওয়া। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষ কিভাবে নিজেকে অপমানিত করে? তিনি বললেন, 'নিজেকে এমন বিপদের মুখোমুখি করা যার মোকাবেলা করার শক্তি তার নেই' *(তিরমিযী হা/২২৫৪; মিশকাত/২৫০৩; ছহীহাহ হা/৬১৩)*। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী না হ'লে তা ভঙ্গ করা যাবে না *(মুসলিম হা/১৮৩৯)*।

অতএব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং রাষ্ট্রীয় বিধান অমান্য করে অবৈধ পথে জীবিকার সন্ধানে বিদেশ ভ্রমণ করা যাবে না। বরং রূযীর জন্য তাদেরকে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। কেননা তিনি বলেছেন, 'আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই' *(হূদ ১১/৬)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন'। 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : ওযূ করার পরে বায়ু নিঃসরণ হয়েছে এরকম মনে সন্দেহ সৃষ্টি হ'লে করণীয় কি?

-এনামুল হুদা, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় নিশ্চিত না হলে ছালাতসহ অন্যান্য ইবাদত চালিয়ে যাবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৭/১২২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'স্পষ্টভাবে বায়ুর শব্দ বা গন্ধ না পেলে ওযূ করতে হবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/৫১৫; মিশকাত হা/৩১০; ছহীহুল জামে হা/৭৫৭২)*। কারণ সন্দেহ বা ওয়াসওয়াসা উপেক্ষা করাই শরী'আতের মূলনীতি *(আল-মাওসূআতুল ফিক্বহিয়াহ ১৭/১২২)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ছালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হ'লে কিবলা নির্ধারণ ও সিটে বসে ছালাত আদায়ের নিয়ম কি?

-আব্দুল্লাহ রাইসান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এসময় জমা ও ক্বছর এবং তাক্বদীম বা তাখীর করার সুযোগ আছে। আর সফর অবস্থায় জমা তাক্বদীম বা তাখীর করাই উত্তম *(বুখারী হা/১১১২; মুসলিম হা/৭০৪; মিশকাত হা/১৩৪৪)*। অর্থাৎ গন্তব্যে পৌঁছার পরে সময়ানুযায়ী যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও এশা একত্রে জমা তাক্বদীম অথবা জমা তাখীর তথা পরের ছালাত আগে এনে বা আগের ছালাত পরে নিয়ে জমা করা যায় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৪৪)*।

আর পরিবহনে কিংবা ভীতিকর অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ক্বিবলামুখী না হ'লেও চলবে *(বাক্বারাহ ২/১১৫; ইরওয়া হা/৫৮৮)*। তবে ছালাত শুরু করার সময় ক্বিবলামুখী হওয়া বাঞ্ছনীয় *(আবুদাঊদ হা/১২২৪-২৮)*। রুকূ-সিজদা করা অসুবিধা হ'লে কেবল তাকবীর দিয়ে হাত ও মাথার ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় মাথা রুকূর চেয়ে কিছুটা বেশী নীচু করবে *(আবুদাঊদ হা/১২২৭; ছিফাত ৫৫-৫৬ পৃ.)*। ক্বিবলা ঠিক করা অসম্ভব বিবেচিত হ'লে নিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে ক্বিবলার নিয়তে একদিকে ফিরে ছালাত আদায় করবে *(তিরমিযী হা/৩৪৫; ইরওয়া হা/২৯১; বিস্তারিত দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'পরিবহনে ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : বিতর ছালাত দো'আ কুনূত ছাড়া আদায় করা যাবে কি?

-রাকীবুয্যমান, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : দো'আ কুনূত ছাড়াও বিতর আদায় করা যাবে। কেননা বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পাঠ করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। কেউ চাইলে পড়তে পারে আবার ছেড়েও দিতে পারে। তবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দো'আ হওয়ায় তা

সূচীপত্র

পাঠ করাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) তাঁর নাতি হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে বিতর ছালাতের জন্য দো‘আ কুনূত শিখিয়েছিলেন, ‘আল্ল-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা... *(আবুদাঊদ হা/১৪২৫; মিশকাত হা/১২৭৩, সনদ ছহীহ)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ বিতরে দো‘আ কুনূত পাঠ করতেন *(মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/৬৯১১; ইরওয়া হা/৪২৬)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : সুস্থ ও সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী সন্তান নিতে না চাইলে তাকে চাপ প্রয়োগ বা বাধ্য করা যাবে কি? এক্ষেত্রে স্ত্রী কথা না শুনলে তালাক দেওয়া যাবে কি?

-শহীদুল্লাহ কায়ছার, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : সন্তান জন্মদান স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। এর অন্যথা করলে তাদেরকে আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে। স্বামী বা স্ত্রী কেউ কাউকে এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারে না। সুতরাং গর্ভধারণ বা সন্তান প্রসবে কোন শারীরিক জটিলতা না থাকলে সন্তান জন্মদানে স্ত্রীর অস্বীকৃতি জানানো বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, ‘অতএব এখন তোমরা স্ত্রীগমন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা সন্ধান কর’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। অর্থাৎ বিয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান জন্ম দেওয়া। মা‘ক্বিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি অত্যন্ত মর্যাদাশীল ও উচ্চবংশীয় এক মহিলার সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু তিনি সন্তান দানে অক্ষম (বন্ধ্যা)। আমি কি তাকে বিয়ে করব? তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তারপর লোকটি দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট আসল। তিনি আবারও তাকে নিষেধ করলেন। এরপর তৃতীয়বার আসলে তিনি আবারও তাকে নিষেধ করে বললেন, ‘তোমরা এমন নারীকে বিয়ে কর, যে অধিক স্বামী সোহাগিনী এবং অধিক সন্তানদায়িনী। কেননা আমি (ক্বিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করব’ *(আবুদাঊদ হা/২০৫০; ছহীহুত তারগীব হা/১৯২১)*।

এক্ষণে স্ত্রী সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সন্তান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে স্বামী প্রথমে নছীহত করবে। এরপরেও স্ত্রী হঠকারিতা প্রদর্শন অব্যাহত রাখলে বাধ্যগত অবস্থায় তিনি তালাকের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : একটি গোপন গোনাহ থেকে বাঁচতে আমি নিয়মিত নফল ছিয়াম ও আল্লাহ্র কাছে দো‘আ করছি। কিন্তু বারবার সেই গোনাহের চক্রে ফিরে যাচ্ছি। দো‘আ কবুল না হওয়া এবং গোনাহ ছাড়তে না পারার ব্যর্থতা আমাকে চরম হতাশায় ফেলেছে। একজন মুমিন হিসাবে আমার এই পরিস্থিতিকে কিভাবে দেখা উচিত এবং গোনাহের এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি?

-মাহমূদ হাসান, ঢাকা।

উত্তর : গোনাহের ধরণ এবং প্রকৃতি দেখে তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষণে কেউ যদি নির্জনে গোপন পাপে লিপ্ত হয় এবং অবস্থার পরিবর্তন না করে, তাহ’লে সে কেবল দো‘আর মাধ্যমে রক্ষা নাও পেতে পারে। সেকারণ প্রয়োজনবোধে জায়গা পরিবর্তন করতে হবে ও নির্জনতা পরিহার করতে হবে। গোপন পাপ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত ছালাত আদায় ও ছিয়াম পালনের পাশাপাশি সামর্থ্য থাকলে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে করতে হবে। এছাড়া সৎসঙ্গ গ্রহণ, একাকিত্ব বর্জন, গোপন পাপের উপকরণ সমূহ পরিহার করে মসজিদে জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায়, তওবা-ইস্তেগফার, যিকির-আযকার ও তাসবীহ পাঠে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীরচর্চার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সচেষ্ট হবে। সর্বোপরি ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির অনুশীলন করবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ আমাকে দেখছেন ও আমার মনের ও মুখের কথা শুনছেন, এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ’ *(ইসরা ১৭/৩২)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : আমি একটি ক্রেডিট রেটিং কোম্পানীতে চাকরি করতাম। এখন সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। উক্ত চাকরিকালীন উপার্জিত অর্থ থেকে আমি কিছু টাকা ঋণ প্রদান করেছিলাম। পরবর্তীতে জানতে পেরেছি যে, ঐ প্রতিষ্ঠানের চাকরির আয় হালাল ছিল না। এখন সেই টাকা আমার জন্য হালাল হবে কি?

-সাদিয়া, নাখালপাড়া, ঢাকা।

উত্তর : ঋণ দেওয়া উক্ত টাকা গ্রহণ করা এবং তা ভোগ করা যাবে। কারণ তা তার উপার্জিত অর্থ এবং হারাম জানার পূর্বের বিষয় ছিল *(ওছায়মীন, আল-লিকাউশ শাহরী ১১/৬৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/৪৬)*। আল্লাহ বলেন, অতঃপর যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এলো এবং সে বিরত হ’ল, তার অতীতে যা হয়েছে তা তারই (অর্থাৎ তা ফেরত দিতে হবে না); আর তার ক্ষমার বিষয়টি আল্লাহ্র এখতিয়ারে ন্যস্ত’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। তবে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ হালাল উপার্জনের পথ অবলম্বন করা এবং অতীতের বিষয়ে আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি মা অসুস্থ থাকেন বা বাচ্চা বুকের দুধ না পায়, তবে নবজাতককে কি তার আপন নানীর বুকের দুধ পান করানো যাবে? এর ফলে নানী কি ঐ শিশুর দুধ মা হিসাবে গণ্য হবেন এবং এর ফলে মাহরাম বা রক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আসবে কি?

-মীম খাতুন, সাভার।

উত্তর : শিশুর নানীর দুধ পান করতে পারবে। এতে নানী তার নিজ সম্পর্কের পাশাপাশি দুধ মা হিসাবে গণ্য হবেন। ফলে সে তার খালাতো এবং মামাতো বোনকে বিয়ে করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বংশগত কারণে যেসব সম্পর্ক হারাম হয়, দুধপানের কারণেও সেসব সম্পর্ক হারাম হয়ে যায় *(বুখারী হা/২৬৪৫)*। শায়েখ বিন বায ও ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদি কোন শিশু তার নানী থেকে দুই বছরের মধ্যে পাঁচবার বা তার বেশী তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করে, তবে নানী তার দুধ-মা হয়ে যান। এর ফলে কিছু বৈবাহিক

নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়; যেখানে শিশুটি তার দুধ-সন্তান হিসাবে গণ্য হয় এবং তার খালা ও মামাদের (নানীর ছেলে ও মেয়েদের) ভাই হয়ে যায়। এছাড়া সে তার সকল মামাতো ও খালাতো বোনদের জন্য মাহরাম হয়ে যায় *(ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৩৩৬; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/০২)*।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : আমি প্রতিদিন যোহর ছালাতের পর মরুভূমিতে ডিউটিতে যাই। সেখানে আছর এবং মাগরিব ছালাত পড়তে হয়। সেখানে পানির ব্যবস্থা না থাকায় আমি কি প্রতিদিন তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারব?

-সুজা মিয়াঁ, দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তর : পানি সাথে করে নিয়ে যাবে এবং ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। কারণ এটি প্রতিদিনের নির্ধারিত দায়িত্ব। কোন দিন পানি নিয়ে যেতে ভুলে গেলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম সফরকালীন সময়ে পানি সাথে থাকলে তা দিয়ে ওযূ করে ছালাত আদায় করতেন। পানি না থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/৩৪৪, ৩৪৮; মুসলিম হা/৩৬৮)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : অনেক সময় প্রসবকালীন জটিলতা বা সিজারিয়ান অপারেশনকালে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানান যে, মা ও সন্তানের মধ্যে কেবল একজনকে বাঁচানো সম্ভব। এ ধরনের সংকটময় অবস্থায় পরিবার এবং মা- কার কী ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। কারণ অপ্রকাশ্য ও সুপ্ত জীবনের চেয়ে জীবন্ত এবং প্রকাশ্য জীবনের গুরুত্ব অনেক বেশী *(আল-ফাতাওয়াল জামে‘আ ৩/১০৫৬; বিন বায, ফাতাওয়াদ-দুরূস)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : বাড়ীওয়ালা ঋণের প্রয়োজনে ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ১২ লক্ষ টাকা গ্রহণ করতে চান। বিনিময়ে ভাড়াটিয়া শর্ত দিয়েছেন যে, ঋণের টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মাসিক ১০,০০০ টাকা ভাড়ার পরিবর্তে তিনি ৪,০০০ টাকা ভাড়া দিবেন। অর্থাৎ ঋণের কারণে তিনি মাসিক ৬,০০০ টাকা ভাড়ার ছাড় পাবেন। পরবর্তীতে মালিক পুরো টাকা ফেরত দিলে পুনরায় নিয়মিত ভাড়া কার্যকর হবে। শারঈ দৃষ্টিতে ঋণের শর্তে এভাবে ভাড়া কমিয়ে নেওয়া বা কম ভাড়ায় চুক্তি করা বৈধ হবে কি?

-ইমরান, ঢাকা।

উত্তর : এভাবে চুক্তি করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ঋণের বিনিময়ে লাভবান হওয়ায় তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে *(বায়হাক্বী হা/১১২৫২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘প্রত্যেক ঋণ যা লাভ নিয়ে আসে, সেটাই সূদ’ *(ইরওয়া হা/১৩৯৭)*। আবু বুরদাহ (রাঃ) বলেন, আমি মদীনায় আসলাম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি আমার ঘরে আসবে? আমি তোমাকে ছাতু এবং খেজুর খাওয়াব। এরপর আমরা গেলাম এবং তিনি আমাদের ছাতু ও খেজুর খাওয়ালেন। তারপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এমন এক ভূখণ্ডে আছ যেখানে সূদের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সুতরাং কারো কাছে যদি তোমার পাওনা থাকে এবং সে তোমাকে এক বোঝা ঘাস বা বার্লি কিংবা এক আঁটি খড়ও উপহার দেয়, তবে তা গ্রহণ করো না। কারণ সেটিও সূদের অন্তর্ভুক্ত *(বায়হাক্বী, শো‘আবুল ঈমান হা/৫১৪৫)*। তবে বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়া থেকে গৃহীত ঋণ প্রতি মাসে নির্ধারিত বাড়ি ভাড়া থেকে কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারেন বা কেটে রাখতে পারেন।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : হাদীছে এসেছে করযে হাসানা প্রদান করলে ঋণ দানের চেয়েও বেশী নেকী লাভ হয়। কিন্তু ব্যবসার টাকা বাকী রাখলে তার জন্য কি করযে হাসানার ছওয়াব পাওয়া যাবে? যেহেতু পণ্য বাকী দেওয়া করয দেওয়ার মতই।

-আব্দুর রহমান, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : বাকীতে পণ্য প্রদান করা বৈধ বাণিজ্যিক লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত এবং এতে ছওয়াব রয়েছে। তবে এটি করযে হাসানা থেকে ভিন্ন। কারণ করযে হাসানা বলতে কোন প্রকার লাভ ছাড়াই বিপদগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণে সরাসরি অর্থ ঋণ দেওয়াকে বুঝায়। যেখানে কোন লাভের আশা থাকে না। অপরদিকে বাকীতে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভবান হওয়া যায়। এটি যেমন সূদ হবে না তেমনি করযে হাসানা সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং এতে ক্রেতার প্রতি ইহসান হয়; যার ফলে বিক্রেতা ছওয়াব লাভ করবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মু‘আক্কিঈন ২/১১; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ৯/৯৩)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : শারঈ কোন কারণ ছাড়া নিজেকে বিনয়ী রাখার জন্য সারা বছর মাথা মুণ্ডন করে রাখা জায়েয হবে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : স্থায়ীভাবে মাথা মুণ্ডানো ঠিক নয়। এটা খারেজীদের একটি বৈশিষ্ট্য *(বুখারী হা/৭৫৬২; আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩৫৪৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তাদের লক্ষণ হ’ল মাথা মুণ্ডন করা এবং (চুল) উপড়ে ফেলা (বা খুব ছোট করে ছাঁটা)। সুতরাং তোমরা যখন তাদের দেখবে, তখন তাদের নির্মূল করবে’ *(আবুদাঊদ হা/৪৭৬৬, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, ‘কপাল বা মাথার সম্মুখভাগের চুল কাটা বা মুণ্ডন করা থেকে বিরত থাক’ *(ছহীহুত তারগীব হা/২৭২৩)*। তবে বিশেষ কোন কারণে বা সাময়িকভাবে মাথা মুণ্ডন করা যায় *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৬৩)*।

উল্লেখ্য যে, চুলের গোড়ায় নাপাকী থাকবে মনে করে অনেক মুরব্বী সর্বদা মাথা ন্যাড়া করে রাখেন। আর দলীল হিসাবে আলী (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত একটি হাদীছ পেশ করেন, যার সনদ মুনকার ও যঈফ *(আবুদাঊদ হা/২৪৮ ও ২৪৯; মিশকাত হা/৪৪৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩০ ও ৩৮০১)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : দাড়ি কোঁকড়ানো থাকলে তা হিট দিয়ে সোজা করা যাবে কি?

-মামুন, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : বৈদ্যুতিক তাপ দিয়ে চুল সোজা করাতে দোষ নেই যদি তাতে ক্ষতিকর কোন উপাদান না থাকে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৬৮)*। চিরুনী ও তেল ব্যবহারের মাধ্যমে দাড়িকে

সূচীপত্র

পরিপাটি রাখা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার চুল আছে, সে যেন তার যত্ন নেয়' *(আবুদাঊদ হা/৪১৬৩; মিশকাত হা/৪৪৫০)*। ইবনু বাত্ত্বাল বলেন, আর তারজীল হ'ল মাথা ও দাড়ির চুল আঁচড়ানো এবং তাতে তেল ব্যবহার করা। এটি পরিচ্ছন্নতার অন্তর্ভুক্ত, আর শরী'আত এর প্রতি উৎসাহিত করেছে *(ফাৎহুল বারী ১০/৩৬৮)*। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, আর এতে (এই হাদীছ বা নির্দেশনায়) মাথা ও দাড়ির চুল আঁচড়ানোর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে অবহেলা করা কিংবা এ থেকে গাফেল থাকাকে অপসন্দ করা হয়েছে; যার ফলে চুল অবিন্যস্ত, জট পাকানো বা অসুন্দর দেখায় *(আত-তামহীদ ৫/৫)*। অতএব প্রয়োজনে হিট মেশিন বা এজাতীয় কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহারে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : আমি একটি বড় ভবনে থাকি। ভবন মালিকের পক্ষ থেকে প্রতি ফ্লাটে সেন্ট্রাল সাউন্ড সিস্টেম বসাতে চাচ্ছে যাতে মুছল্লীদের সতর্ক করার জন্য ছালাতের সময় আযান চালু করা যায়। এভাবে মসজিদের বাইরে আযান চালু করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আব্দুল মান্নান, কৃষ্ণপুর, ত্রিমোহিনী, রাজশাহী।

উত্তর : মুছল্লীদেরকে ছালাতের সময় সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য আযানের অ্যালার্ম চালু করা যায়। তবে শর্ত হচ্ছে ইসলামের এই শে'আর বা নিদর্শনে যাতে কোন অসম্মান না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। পাশাপাশি এটা যেন কারো কষ্টের কারণ না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১০৫)*। তবে এই আযানের জওয়াব দিতে হবে না। কারণ এটি প্রকৃত আযান নয় *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১২৩)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : পারিবারিকভাবে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে এবং শরী'আত মোতাবেক আমাদের ঈজাব-কবুল সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু বাধ্যগত কারণে অলীমা কয়েকমাস পরে হবে। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে ফোনে কথাবার্তা বলতে পারব কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : মেয়ের অভিভাবকের সম্মতিতে ইজাব ও কবূল হয়ে থাকলে স্ত্রীর উপর স্বামীর বৈবাহিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষণে স্বামী-স্ত্রী ফোনে কথা বলা সহ বৈধ সবকিছুই করতে পারবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৩৯২)*। আর রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসারে বাসর যাপনের পরই অলীমা করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর সাথে বাসর রাত অতিবাহিত করার পর দিন অলীমা করেছিলেন *(বুখারী হা/৫১৭০)*। ছাফিয়াহ (রাঃ)-কে বিবাহের পর তিনি তিনদিন যাবৎ অলীমা করেছিলেন *(মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৩৮৩৪, সনদ হাসান)*। তবে বিশেষ কারণে যদি সম্ভব না হয়, তবে বাসর যাপনের আগে বা পরে যেকোন দিন করতে পারে *(ফাৎহুল বারী ৯/২৩০; ইবনু তায়মিয়াহ, আল ইখতিয়ারাত পৃ. ৩৪৬)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : যে সমস্ত মাছ ময়লা ও পচা খাবার খায় এবং নোংরা পানিতে বেড়ে ওঠে যেমন মাগুর, পাঙ্গাস প্রভৃতি এগুলো মাছ কি খাওয়া জায়েয হবে?

-মারূফ, দিনাজপুর।

উত্তর : যদি মাছকে দেওয়া খাবারের অধিকাংশ পবিত্র হয়, তবে সেই মাছ খাওয়া জায়েয এবং এতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি খাবারের অধিকাংশ নাপাক বা মৃত বস্তু হয়, তবে সেই মাছ খাওয়া জায়েয হবে না। যতক্ষণ না তাকে তিন দিন বা তার বেশী সময় নাপাক খাবার থেকে দূরে রাখা হয় এবং পবিত্র খাবার খাওয়ানো হয়, যাতে তা পবিত্র ও সুস্বাদু হয়। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যেসব পশু-পাখি অপবিত্র বস্তু বা নাপাকী ভক্ষণ করে (জালালা), নবী করীম (ছাঃ) সেগুলোর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন। তবে সেগুলোকে যদি (৩ দিন) আটকে রাখা হয় যতক্ষণ না তা পবিত্র হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতভাবে তা হালাল হয়ে যায় *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/৬১৮)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : মাহরামের সাথে হজ্জ করতে গিয়ে তিনি অসুস্থ থাকায় অন্য মহিলাদের সাথে একাকী হারামে গিয়ে তাওয়াফ ও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নোহা আখতার, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : পরিবেশ নিরাপদ থাকলে অন্য মহিলাদের সাথে কা'বায় গিয়ে ছালাত আদায় ও তাওয়াফ করতে কোন বাধা নেই *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/৫৩)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : অনেকেরই ধারণা মক্কায় মৃত্যুবরণ করলে অথবা মসজিদে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। এই বিশ্বাসগুলো কি সঠিক?

-রিফাত, কুমিল্লা।

উত্তর : পবিত্র স্থানসমূহ অন্যান্য স্থানের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আর সেখানে মৃত্যুবরণের ফযীলত সম্পর্কে কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যা অন্য স্থানের তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ বহন করে। বিশেষত মদীনা মুনাউওয়ারার ক্ষেত্রে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হয়, সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। কারণ যে ব্যক্তি মদীনায় মারা যাবে, ক্বিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী বা সুফারিশকারী হব' *(তিরমিযী হা/৩৯১৭; মিশকাত হা/২৭৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬০১৫)*। ওমর (রাঃ) দো'আয় বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার পথে শাহাদাত দান কর এবং আমার মৃত্যু তোমার রাসূলের শহরে (মদীনায়) দান কর' *(বুখারী হা/১৮৯০)*। অনুরূপভাবে মসজিদও বরকতপূর্ণ স্থান ও ইবাদতখানা। এখানে যারা আসে সাধারণত উত্তম মানুষেরাই আসে। সুতরাং কেউ মসজিদে ইবাদতরত অবস্থায় মারা গেলে তার উত্তম মৃত্যুর আশা করা যায়।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : নারীদের জন্য দাওয়াতী কাজের বিধান কি? তারা ঘরের বাইরে শিক্ষা বা দাওয়াতী কাজে যেতে পারবে কি?

-আখতারা, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ বিবেচনায় এবং স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামী পর্দা সহকারে মহিলাগণ দ্বীনের কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারেন। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'বল, এটাই আমার পথ। আহ্বান করি আল্লাহ্‌র

দিকে আমি এবং আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে’ *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। ‘অনুসারীগণ’ বলতে এখানে মুসলিম নারী ও পুরুষ উভয়কে বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) হাদীছ শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, আমরা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান হাছিল করতাম’ *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, হা/৬১৮৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে মুসলিম মহিলাগণ ৫ম হিজরীতে পর্দা ফরয হওয়ার আগে ও পরে পর্দার সঙ্গে দ্বীনের কাজে ও দুনিয়ার কাজে বাড়ীর বাইরে যেতেন। তারা যেমন মসজিদে ও ঈদের জামা‘আতে যোগদান করতেন। তেমনি বাজারে, ক্ষেতে-খামারে ও জিহাদেও গমন করতেন *(বুখারী হা/৫২২৪, মুসলিম হা/১৮১০)*। অতএব দ্বীনী কাজে বিশেষ করে দ্বীন শিক্ষা করা বা দ্বীন শিক্ষা দেওয়া দু’টি কাজই পুরুষের ন্যায় মেয়েরা ঘরে বসে কিংবা প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের (পুরুষ ও নারী উভয়ের) উপর ফরয’ *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৮)*। তিনি বলেন, ‘তোমরা একটি আয়াত জানলেও তা আমার পক্ষ হ’তে অন্যকে পৌছে দাও’ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত মর্মের আয়াত (ও হাদীছ) সমূহ পুরুষ ও নারী উভয়কে শামিল করে’ *(মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৭/৩২৫ পৃঃ)*। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইয়ামনে ও অন্যান্য বহু গোত্রে দাঈদের প্রেরণ করতেন এবং এতে কোন বাধা ছিল না যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে করে নিয়ে যেতেন’ *(ঐ, ৯/২৯৫ পৃঃ)*। এছাড়া শায়খ উছায়মীন, শায়খ আলবানীসহ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(আলবানী, সিলসিলা হুদা ওয়ান নূর, অডিও ফাইল নং ১৮৯, ফৎওয়া নং ১৮; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ দারব, ‘ইলম’ অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য যে, নারীর মূল দায়িত্ব হ’ল তার ঘরে। তাই পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পর সময়-সুযোগ পেলে পর্দা-পুশিদা সহকারে দ্বীনের দাওয়াত দান ও দ্বীন শিক্ষার কাজে অবশ্যই মহিলাগণ বাইরে যেতে পারবেন।

নারীদের কণ্ঠস্বর তাদের লজ্জার অন্তর্ভুক্ত। অতএব তাদের কণ্ঠস্বর যেন পরপুরুষ শুনতে না পায় বা তাদের দৃষ্টি না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : যাকাতের টাকা দিয়ে ইসলামী বই-পত্র কিনে বিতরণ করা বা কোন দাওয়াতী কাজে ব্যবহার করা যাবে কি?

-হারূনুর রশীদ, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : যাকাতের টাকা দিয়ে বই পত্র প্রকাশ বা ক্রয় করে সবার মাঝে বিতরণ করা বা দাওয়াতী কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে ইজতিহাদী মতভেদ রয়েছে। জমহূর বিদ্বানদের মতে, এটা জায়েয হবে না। কারণ যাকাতের হকদার নির্দিষ্ট *(তওবাহ ৯/৬০)*। তাদের নিকট যাকাতের ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ খাতটি শুধুমাত্র জিহাদের জন্য নির্দিষ্ট *(নববী, আল-মাজমু‘ ৬/২১২)*। তবে সমকালীন বিদ্বানদের অনেকেই জিহাদের বিষয়টি আরো ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন *(সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৯৪, ৩৭০; দ্র. যাকাত ও ছাদাক্বা বই পৃ. ৩০-৩৮)*। যার ধারাবাহিকতায় মক্কায় মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের ফিক্বহ কাউন্সিল ১৪০৬ হিজরী (১৯৮৬ খৃ.)-এর রজব মাসে অনুষ্ঠিত ৯ম অধিবেশনে পূর্ববর্তী ৮ম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত *(قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة সিদ্ধান্ত নং-৪, পৃ. ১৭৩-৭৪)* পুনর্ব্যক্ত করে উল্লেখ করে যে, আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত এবং দাওয়াতকে সহায়তা করে এমন কাজ এবং দ্বীন প্রচারের কার্যক্রমসমূহ ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ খাতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যাকাতের আটটি খাতের একটি ‘ফী সাবীলিল্লাহ’-এর মধ্যে এসব কাজও অন্তর্ভুক্ত হ’তে পারে। তারা বলেন, ইসলামে জিহাদ শুধু অস্ত্রের যুদ্ধ নয় বরং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ’ল দাওয়াত, বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধৈর্যধারণ প্রভৃতি। এমনকি যবান ও সম্পদের মাধ্যমেও জিহাদ হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের মাল, জান ও যবানের মাধ্যমে’ *(আবূদাঊদ হা/২৫০৪)*। অর্থাৎ সম্পদের মাধ্যমে, কলম ও বক্তব্যের মাধ্যমে, মিডিয়া ও শিক্ষার মাধ্যমে দ্বীনের সংগ্রামও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দ্বীনী দাওয়াত, ইসলামী শিক্ষা, মাদ্রাসা, ইসলামী মিডিয়া প্রভৃতি যদি বিশুদ্ধ ইসলামের সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য হয়, তাহলে তা ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ খাতের অন্তর্ভুক্ত হ’তে পারে। তবে শর্ত হ’ল, তা অবশ্যই প্রকৃত অর্থে ইসলামী ও অলাভজনক উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় পরিচালিত হ’তে হবে *(সিদ্ধান্ত নং-৫, পৃ. ১৯৬)*। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে যাকাতের টাকা দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বই সমূহ বিতরণ করা যাবে। মারদাভী বলেন, শায়েখ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) পসন্দ করেছেন যে, যাকাতের অর্থ দিয়ে এমন ইলমী কিতাব কেনা জায়েয যা দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সাধিত হয় এবং যা শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তার রয়েছে। আর এটাই সঠিক অভিমত *(আল-ইনছাফ ৩/২১৮; বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত ‘যাকাত ও ছাদাক্বা’ বই)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : আমার নানী মৃত্যুর আগে বদলী হজ্জের অছিয়ত করে গিয়েছিলেন। এ বছর ওয়ারিছদের সিদ্ধান্তে আমি সেই হজ্জ সম্পন্ন করি। হজ্জের খরচ বাবদ নানীর রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আমাকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, সফর শেষে দেশে ফেরার পর দেখা যাচ্ছে প্রায় আট হাযার টাকা অতিরিক্ত রয়ে গেছে। এ টাকাগুলো কি ওয়ারিছদের না জানিয়ে আমি নিজের কাছে রাখতে পারব? নাকি তাদের ফেরত দেওয়া যরূরী? অনুগ্রহ করে জানাবেন।

-আবু ওবায়দা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত টাকা ওয়ারিছদের ফেরত দিবে। কারণ মাইয়েতের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির মালিক হয়ে যান ওয়ারিছগণ। তবে ওয়ারিছদের সম্মতি নিয়ে উক্ত টাকা নিজে ভোগ করতে পারেন বা নানীর নামে দান করে দিতে পারেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/২২৫)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : পালক সন্তান বড় হ’লে মায়ের সাথে তার পর্দার বিধান কেমন হবে? তাকে সম্পদ না দিয়ে পালক পিতা মৃত্যুবরণ করলে সে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তির

অধিকারী হবে কি? এছাড়া তাকে সব সম্পদ হেবা করে দেয়া যাবে কি?

-মাহফূয, দিনাজপুর।

উত্তর : পালিত সন্তান গায়ের মাহরাম। তার থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হবে। পালিত সন্তান কোন সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না। এক্ষণে কেউ চাইলে পালিত সন্তানকে কিছু সম্পত্তি বা সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ দানের অছিয়ত করতে পারেন। না করলে গোনাহ হবে না। নিজ পরিবার, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন থাকলে পুরো সম্পত্তি পালিত সন্তানকে দান করা যাবে না *(বুখারী হা/১২৯৫; মিশকাত হা/৩০৭১)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী একদল মুসলিম কোন খোলা স্থানে নিয়মিত জুম'আ বা ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-আব্দুর রঊফ, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : যতদিন মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব না হবে, ততদিন খোলা স্থানে জুম'আর ছালাত আদায় করতে পারে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৮৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৭৭; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৭৪)*। আর ঈদের ছালাত খোলাস্থানে পড়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীর বাইরে ৫০০ গজ পূর্বে 'বাত্বহান' সমতলভূমিতে খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৩০৪; যাদুল মা'আদ ১/৪২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : পরীক্ষার খাতায় কারো সামান্য কিছু দেখে লেখা বা কমন না পেয়ে বিপদগ্রস্ত এমন কাউকে খাতা দেখানো জায়েয হবে কি?

-মুশফিকুল আলম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : পরীক্ষার হল পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত। এখানে একে অপরকে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ। সুতরাং এভাবে কাউকে সহযোগিতা করা প্রতারণার শামিল, যা থেকে বিরত থাকতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১২/১৯৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : আমাদের এলাকায় এক ধরনের খাঁচা ব্যবহার করে ইঁদুর ধরা হয়। অনেক সময় খাঁচা থেকে ইঁদুর বের করে মারা কষ্টকর হওয়ায় অনেকে ইঁদুরসহ খাঁচাটি পানিতে ডুবিয়ে রেখে মেরে ফেলে। এভাবে কোন প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে বা পানিতে ডুবিয়ে মারা জায়েয হবে কি?

-তালহা ফাহীম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : যেকোন ক্ষতিকর প্রাণীকে হত্যা করার সময়ও তার প্রতি ইহসান করতে হবে। অর্থাৎ তাকে কষ্ট না দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত মারা যায় এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। রাসূল (ছা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান ফরয করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করো। আর যখন তোমরা যবেহ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করো। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার যবেহকৃত পশুকে আরাম দেয়' *(মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩)*। উল্লেখ্য যে ইঁদুর এমন ক্ষতিকর প্রাণী যাকে রাসূল (ছাঃ) হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পাঁচটি ক্ষতিকর প্রাণী রয়েছে, যাদেরকে হারামের বাইরে এবং হারামের সীমানার মধ্যে উভয় স্থানেই হত্যা করা যায়। যেমন- সাপ, কাক, ইঁদুর, পাগলা কুকুর ও চিল *(মুসলিম হা/১১৯৮; মিশকাত হা/২৬৯৯)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : অনেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 'আসসালামু আলাইকুম' না বলে 'স্লামালাইকুম' বলে ফেলে। এভাবে বিকৃত উচ্চারণের কারণে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মৌলভীবাজার।

উত্তর : সালামের সঠিক উচ্চারণ করা কর্তব্য। কারণ উচ্চারণ ভুলের কারণে অর্থ ভুল হয়ে যায়। যেমন ইহূদীরা রাসূল (ছাঃ)-কে 'আস-সামু আলাইকুম' তথা আপনার মৃত্যু হৌক বলে সালাম দিত। যার উদ্দেশ্য ছিল শব্দ বিকৃত করে বদ দো'আ করা *(বুখারী হা/৬০২৪; মিশকাত হা/৪৬৩৮)*। সেজন্য সালাম আদান এবং উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ভুলক্রমে উচ্চারণ বিকৃত হলে গুনাহ নেই, কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ বিকৃতভাবে উচ্চারণ করলে সে গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : একজন ব্যক্তি রোড এক্সিডেন্ট করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরপরে আইসিইউতে ছয়দিন থাকার পর মৃত্যুবরণ করে। এভাবে মৃত্যুবরণ করা শহীদি মৃত্যু হিসাবে গণ্য হবে কি?

-মাহবূবা আফরোয, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এরূপ ব্যক্তি মুমিন হ'লে শহীদদের পর্যায়ভুক্ত হবেন বলে আশা করা যায়। কারণ গাড়ি দিয়ে ধাক্কা দেওয়া, বা গাড়ি উল্টে যাওয়া, কিংবা গাড়ি দুর্ঘটনা এসবই মূলত হাদীছে বর্ণিত 'স্থাপনা ধ্বসে পড়া' বা দেয়াল চাপায় মৃত্যুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত *(আবুদাউদ হা/৩১১১; মিশকাত হা/১৫৬১; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : আমি বিগত এক বছর যাবত মক্কা শহরে অবস্থান করছি এবং আমার বাসা কা'বার একদম পাশেই অবস্থিত। এমতাবস্থায় হজ্জের সময় আমি যদি সরাসরি আরাফা ময়দানে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম পরিধান করে হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রম পালন করি, তাহ'লে আমার হজ্জ কি সঠিকভাবে আদায় হবে?

-রুশদ খান, মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তর : কোন ব্যক্তি যদি মীক্বাতের সীমানার ভেতরে থাকা অবস্থায় হজ্জ বা ওমরার সংকল্প করেন, তবে তিনি সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবেন। কারণ মীক্বাত হ'ল সেই স্থান যেখান থেকে তিনি হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করেন। রাসূল (ছা.) বলেন, 'আর যারা মীক্বাতের ভিতরে অবস্থান করবে, তারা যেখান থেকে সূচনা করবে সেটিই তাদের ইহরামের স্থান; এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবেন' *(বুখারী হা/১৫২৪; মুসলিম হা/১১৮১)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : সন্তান প্রসবের পর তথা নিফাসকালীন মায়েরা দীর্ঘদিন ছালাত আদায় করতে পারে না। সুস্থ হবার পর সেগুলোর কাযা আদায় করতে হবে, না ফিদইয়া দিলেই যথেষ্ট হবে?

-সজীব, ঢাকা।

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স)]*

উত্তর : হায়েযের মত নিফাস চলাকালীন ছুটে যাওয়া ছালাতেরও ক্বাযা ও কাফফারা বা ফিদইয়া কোনটাই আদায় করতে হবে না। এটি নারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। মু'আযা আদাবিয়া (রহঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী মহিলার কী হয়েছে যে সে ছালাত ক্বাযা করে না কিন্তু ছিয়াম ক্বাযা করে? তখন তিনি বললেন, তুমি কি হারূরিয়া (খারেজী) দলের লোক? বললাম, আমি হারূরিয়া নই, আমি কেবল জানার জন্য জিজ্ঞেস করছি। তিনি বললেন, আমাদের যখন ঋতু হ'ত, তখন আমাদের ছিয়াম ক্বাযা করার নির্দেশ দেওয়া হ'ত, কিন্তু ছালাত ক্বাযা করার নির্দেশ দেওয়া হ'ত না *(মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : যারা আরবী পড়তে পারে না, তাদের জন্য বাংলা উচ্চারণ দেখে কুরআন পড়া জায়েয হবে কি? মাখরাজ ও তাজবীদ না মেনে পড়ার কারণে গুনাহ হবে কি?

**-নুসরাই সিনথিয়া, ফরিদপুর।*

'নুসরাই' প্রকৃত আরবী উচ্চারণ নুছরাত। 'সিনথিয়া' গ্রীকদের নিকট চন্দ্রদেবীর নাম। অতএব আরবী-ফার্সী মিশিয়ে 'নুছরাত জাহান' (পৃথিবীর সাহায্যকারী) নাম রাখা যেতে পারে (স.স.)।]

উত্তর : এভাবে কুরআন পড়া যায়। তবে কুরআন বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াতের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে এবং সঠিক উচ্চারণের ব্যাপারে যত্নবান হ'তে হবে। নিজের ভুল সংশোধন ও জ্ঞান অন্বেষণের জন্য শিক্ষকের দারস্থ হবে। যদি কেউ চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং সঠিক করার জন্য চেষ্টা করে, তবে সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনে দক্ষ, সে সম্মানিত নেককার ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ার সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে তেলাওয়াত করে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব' *(মুসলিম হা/৭৯৮; মিশকাত হা/২১১২)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, তাঁর উচিত কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং নিজের চেয়ে যিনি অধিক জ্ঞানী, তাঁর কাছে তেলাওয়াত করে শোনানোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। (ভুল হওয়ার ভয়ে) তিলাওয়াত ছেড়ে দেওয়া যাবে না। কারণ তেলাওয়াত শেখার চেষ্টা তাঁর কল্যাণই বৃদ্ধি করবে। আর এ ক্ষেত্রে উল্লেখিত হাদীছটি তাঁর জন্য শক্তিশালী দলীল *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/১৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : বিবাহের আক্বদ সম্পন্ন হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ বাসায় আলাদা অবস্থান করে এবং তাঁদের মাঝে কোন শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। এমতাবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ হ'লে ইদ্দত পালন করা আবশ্যক কি? উল্লেখ্য যে ইদ্দত পালন না করেই বিচ্ছেদের ২১ দিন পর অন্যত্র বিবাহ দেওয়া হয়েছে। উক্ত বিবাহ শরী'আত মোতাবেক শুদ্ধ হয়েছে কি?

-সায়রা জান্নাত, ঢাকা।

উত্তর : বিবাহের পর নির্জনবাসের পূর্বে তালাক হয়ে গেলে উক্ত নারীকে ইদ্দত পালন করতে হবে না। বরং তালাকের পরের দিন অন্যত্র বিবাহ হ'লেও সে বিবাহ শুদ্ধ হবে। সুতরাং উক্ত বিবাহে কোন সমস্যা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ কর; অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন ইদ্দত নেই যা তারা গণনা করবে' *(আহযাব ৩৩/৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : আমি আমার ছেলের জন্মদিনে প্রচলিত নিয়মে জন্মদিন পালন না করে একটি করে ছাগল ইয়াতীমখানায় দান করি। এটা জায়েয হবে কি?

-আলী হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : শিশুর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কোন আনুষ্ঠানিকতা করা যাবে না। বরং শিশুর কল্যাণের জন্য দিন নির্ধারণ ছাড়াই যে কোন দিন ইয়াতীমখানায় দান করবে। শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হ'ল এটি নিষিদ্ধ। কারণ ইসলামে ঈদুল আযহা, ঈদুল ফিতর এবং সাপ্তাহিক ঈদ জুম'আর দিন ব্যতিরেকে অন্য কোন উপলক্ষে আর ঈদ নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৩০৩, ১৬/১৯৭)*। অতএব এই দিনকে আলাদাভাবে উদযাপন করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : এক ব্যক্তি মসজিদের ও মুছল্লীদের জিনিসপত্র চুরি করে এবং মুছল্লীদের সাথে হরহামেশাই ঝামেলা করে। সেকারণ মসজিদ কমিটি তাকে মসজিদে আসায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এটা জায়েয হবে কি?

-মারূফ হোসাইন, রাজশাহী।

উত্তর : মুছল্লীদের ছালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন যেকোন ব্যক্তিকে মসজিদে সাময়িকভাবে আসতে নিষেধ করা যাবে। কারণ মসজিদে নিয়মিত জুতা চুরি করার মাধ্যমে মূলত সে মুছল্লীদের কষ্টের কারণ হয়। রাসূল (ছাঃ) কেউ কাঁচা পেঁয়াজ বা রসুন খেলে মুখের দুর্গন্ধের কারণে মুছল্লীদের কষ্টের কথা বিবেচনা করে তাকে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৮৫৫)*। সেখানে চুরি করা বা ঝগড়া-বিবাদ করা এর চাইতে বড় অপরাধ। এছাড়া এর ফলে মুছল্লীদের মনোযোগ দারুনভাবে বিঘ্নিত হয় *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*। তবে তার অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটলে বা সংশোধন হ'লে তাকে মসজিদে আসতে বাধা দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : আমি একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরী করি। এখানে বিভিন্ন হালাল কাজের সাথে একটি সূদী কাজও বিদ্যমান। যেমন প্রতি মাসে কোম্পানী কারো কাছ থেকে সূদের উপর টাকা নিলে সেই প্রফিটের টাকা দিয়ে আসা। এমতাবস্থায় আমার চাকুরীটা হালাল হবে কি?

-আশরাফুল ইসলাম, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : সূদী ব্যাংকের সাথে লেনদেনকারী কোম্পানীতে চাকুরী করা যাবে। তবে কোম্পানীর সূদ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দেখাশুনা ও ব্যাংকের সাথে লেনদেনকারী হিসাবে চাকুরী করা জায়েয নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) সূদ গ্রহণকারী, সূদ দাতা, সূদের লেখক এবং এর সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন

এবং তারা সকলেই সমান *(মুসলিম হা/১৫৯৭; মিশকাত হা/২৮০৭)*। এমন পরিস্থিতিতে সন্দেহযুক্ত কাজ ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি হালাল কর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি সন্দেহযুক্ত বিষয় ছেড়ে দাও এবং নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও’ *(তিরমিযী হা/২৫১৮; মিশকাত হা/২৭৭৩)*। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান’ *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : আমার প্রতিবেশী একজন বয়স্ক মহিলা প্রতিদিন আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। যা সহ্য করা খুবই কষ্টকর। এমতাবস্থায় মন্দ প্রতিবেশী থেকে রেহাই পাওয়া জন্য আমার করণীয় কি?

-আশিকুর রহমান, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তার হেদায়াতের জন্য দো‘আ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘তবে যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি যালেমদের পসন্দ করেন না’ *(শূরা ৪২/৪০)*। তিনি আরো বলেন, ‘রহমান’ (দয়াময়)-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে ‘সালাম’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৩)*। তিনি আরো বলেন, ‘তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে এবং বলে, আমাদের কর্মফল আমাদের ও তোমাদের কর্মফল তোমাদের। তোমাদের প্রতি সালাম (অর্থাৎ পরিত্যাগ)। আমরা মূর্খদের সাথে কথায় জড়াতে চাই না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*। এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। নবী কারীম (ছাঃ) (তিন বার) বললেন, ‘ধৈর্য ধরো। এরপর তৃতীয় বা চতুর্থ বার বললেন, তোমার ঘরের আসবাবপত্র রাস্তায় বের করে রাখো’। বর্ণনাকারী বলেন, সে ব্যক্তি তা-ই করল। এরপর মানুষ যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা জিজ্ঞেস করছিল, তোমার কী হয়েছে? সে বলছিল, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিচ্ছে। তখন যাতায়াতকারী লোকেরা বলতে লাগল, তার ওপর আল্লাহ্র লা‘নত (অভিসম্পাত) বর্ষিত হোক। এরপর সেই (অত্যাচারী) প্রতিবেশী তার কাছে এসে বলল, তোমার মালপত্র ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে আর কখনো কষ্ট দেব না’ *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫২০; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৫৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : আমার পিতা তাঁর বোনদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করে না দিয়েই মারা গেছেন। এক্ষেত্রে সন্তান হিসাবে আমার করণীয় কি?

-হাসান, কুমিল্লা।

উত্তর : সন্তানের করণীয় হচ্ছে ইসলামী শরী‘আত অনুযায়ী ফুফুদের সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া। পিতা ভুল করে গেলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করলে পিতা এবং সন্তান উভয়ে দায়মুক্ত হবেন ইনশাআল্লাহ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ৩১/২৯৭; আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিয়া ৩/৭২)*। আল্লাহ বলেন, ‘পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নারীদের অংশ রয়েছে কম হৌক বা বেশী হৌক। এ অংশ সুনির্ধারিত’ *(নিসা ৪/৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : রাসায়নিক বিষ পবিত্র না অপবিত্র? এটি কাপড়ে লাগলে ঐ কাপড়ে ছালাত হবে কি?

-আবু সাঈদ, খোলাহাটি, পার্বতীপুর।

উত্তর : রাসায়নিক পদার্থ যেমন কীটনাশক, এ্যাসিড, পেইন্ট, ক্লিনার ইত্যাদি অপবিত্র বস্তু হিসাবে গণ্য হয় না। সুতরাং কোন রাসায়নিক পদার্থ কাপড়ে লেগে থাকলে তা পরিধান করে ছালাত আদায় করতে বাধা নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২১/২৬; ফাতাওয়াশ শাবকাতুল ইসলামিয়াহ ১১/১১০)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : আমি এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। অনেক সময় ক্লাসের মধ্যে বেপর্দা নারী শিক্ষিকাদের সাথে কথা বলতে হয়। কথা বলার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের দিকে, বিশেষ করে তাদের চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের সাথে প্রয়োজনে কিভাবে কথা বলতে পারি এবং নিজেকে সংযত রাখতে পারি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : বাধ্যগত অবস্থায় সাধ্যমত দৃষ্টি সংযত রেখে শিক্ষিকার নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নিকট অসংখ্য নারী এসে ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে কথা বলেছেন। তেমনি বহু পুরুষ ছাহাবীও আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এসে বিভিন্ন বিষয়ে জেনেছেন *(তিরমিযী, হা/৬১৮৫, সনদ ছহীহ)*। তবে অবশ্যই নির্জনতা এড়িয়ে চলবে এবং পর্দার বিধান মেনে চলবে *(বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৪/৪৪)*।

হালাল পয়েন্ট বিডি

আমাদের পণ্যসমূহ

- রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী ফরমালিনমুক্ত আম, স্বাদে, ঘ্রাণে ও মানে সেরা, সরাসরি বাগান থেকে আপনার ঘরে!
  আমাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে রাজশাহীর জনপ্রিয় সব জাতের আমঃ হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, ফজলি, গোপালভোগ হারিভাঙ্গাসহ আরও বিভিন্ন জাতের সুস্বাদু আম।

এছাড়াও আমাদের কাছে পাচ্ছেন,

- হোম মেড ঘি
- প্রাকৃতিক চাকের খাঁটি মধু

বি.দ্র. দেশের যেকোন স্থানে খুচরা ও পাইকারী সরবরাহ করা হয়।

সার্বিক যোগাযোগ

প্রোঃ খুরশেদ আলম
মোবাইল : ০১৭৫১৪৭৫৩৬২
বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী

facebook.com/khurshad.rony
Facebook Page : হালাল পয়েন্ট বিডি
E-mail : khurshadrony607@gmail.com
Whatsapp : 01863024259

সূচীপত্র

NOOR
GARMENTS

NOOR Garments নিয়ে এসেছে নতুন কালেকশনের প্রিমিয়াম পাঞ্জাবি, শেরওয়ানি ও কটি, যেখানে আছে শালীনতা, আভিজাত্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের নিখুঁত সমন্বয়।

☎ ০১৭৯২ ০২০৪০৬
fb.com/noorgarmentsraj
www.noorgarments.com.bd
১৩৯, গনকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী
২৭১ (৩য় তলা), আর.ডি.এ মার্কেট, রাজশাহী

Bangladesh
EYE HOSPITAL
Rajshahi Ltd.
Eye Care, We Care

বাংলাদেশ আই হসপিটাল রাজশাহী লিমিটেড

চোখের যত্নে বিশ্বস্ত ঠিকানা

বাংলাদেশের স্বনামধন্য চক্ষু হাসপাতাল ‘বাংলাদেশ আই হসপিটাল’-এর নতুন শাখা এখন রাজশাহীতে

এখানে সকাল ৮-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত রোগী দেখছেন প্রায় ২৫-৩০ জন অভিজ্ঞ ও দক্ষ চক্ষু বিশেষজ্ঞ। চোখের সকল জটিল ও সাধারণ সমস্যার জন্য এখানে রয়েছে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ চক্ষু চিকিৎসা সেবা।

সেবাসমূহ

ছানি (ফ্যাকো) অপারেশন, গ্লুকোমা চিকিৎসা, রেটিনা ও ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি, কর্নিয়া ও চোখের সংক্রমণ, শিশুদের চোখের রোগ ও স্কুইন্ট (ট্যারা), অকুলোপ্লাস্টিক (Oculoplastic) সেবা (চোখের পাতা, চোখের চারপাশ ও টিয়ার ডাক্ট), চশমা ও কনট্যাক্ট লেন্স এবং চোখের সকল আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের রয়েছে সর্বাধুনিক মেশিনারিজ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব পরিবেশ এবং সাশ্রয়ী খরচে মানসম্মত চিকিৎসা।

যোগাযোগ

আই টেন টাওয়ার, এয়ারপোর্ট রোড, আম চত্বর রাজশাহী
মোবাইল : ০৯৬৪৩১২৩১২৩

বাংলাদেশ আই
হসপিটাল
Bangladesh Eye Hospital Rajshahi

কর্মী সম্মেলন ২০২৬

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

১১ই জুলাই
শনিবার
সকাল ৯-টা

জোনাকী কনভেনশন হল
নয়াপল্টন, ঢাকা

প্রধান অতিথি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সভাপতি
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

LIVE
Ahlehadeeth Andolon Bangladesh
Bangladesh Ahlehadeeth Youth Association
AhlehadeethMovementBangladesh

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩। web: www.juboshongho.org

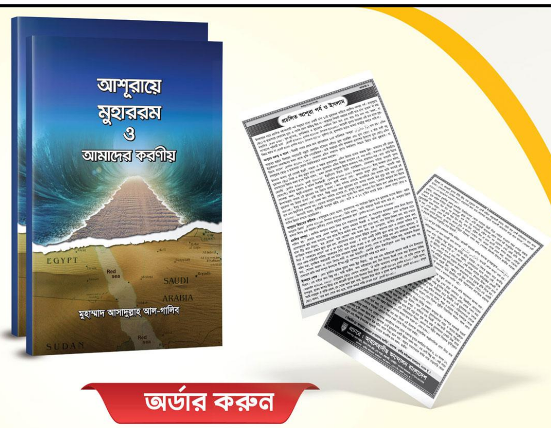
আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়
EGYPT
SAUDI ARABIA
SUDAN
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আশূরার প্রকৃত মর্যাদা কী? এর সঠিক ইতিহাস কী? এই দিনে একজন মুসলিমের করণীয় কী? এসব বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সঠিক দিক-নির্দেশনা পেতে বইটি আজই সংগ্রহ করুন। পাশাপাশি এ সংক্রান্ত লিফলেটটিও নিজে পাঠ করুন এবং অন্যকে সচেতন করতে বিতরণ করুন।

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮০৫৯৫৮৮২২